চিত্রদীপ।

শ্রীঅনুরূপা দেবী প্রণীত।

মূল্য ১৲ টাকা

কলিকাতা, ২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট,
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

The Emerald Printing Works
CALCUTTA

১২ নং সিমলা ষ্ট্রীট,
এমারেল্ড্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীবিহারীলাল নাথ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

সাহিত্য-সাধনার চিরসাথী

সাহিত্য-জগতে সুপরিচিতা লেখিকা

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

পূজনীয়া দিদির

শ্রীচরণকমলে

চিত্রদীপ

প্রদত্ত হইল।

ভূমিকা

পঞ্চদশীর ষষ্ঠ প্রকরণে সৃষ্টির বৈচিত্র্যকে চিত্রপটের সহিত উপমিত করা হইয়াছে। আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থেও পৃথিবীর নানা দিগ্দেশের নরনারীর মনঃকল্পিত চিত্র অঙ্কন চেষ্টা হইয়াছে। মাত্র এই বিচিত্রতার সাদৃশ্য হেতু ইহার নাম দেওয়া হইল চিত্রদীপ।

গল্পগুলির অধিকাংশই আমার প্রতি পরম স্নেহশীলা মাননীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর যত্নে ও আগ্রহে পূর্ব্বে ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার অধিকাংশই বহুপূর্ব্বের রচনা। ভারতবর্ষ, সুপ্রভাত প্রভৃতিতেও ইহার কয়েকটি গল্প বাহির হইয়াছিল। কোনটিই অনুবাদ নহে। 'বন্ধু' গল্পটি কেবল ইংরাজীর ছায়াবলম্বনে লিখিত।

১লা মাঘ,
অসিধাম, কাশী।

লেখিকা

সূচিপত্র ।

বিষয়				পৃষ্ঠা ।
গুরুদক্ষিণা	...	...	...	১
পরাজয়	...	...	...	২৩
বিস্মৃত-স্মৃতি	...	...	...	৫৩
দেবদাসী	...	...	...	৮৩
বন্ধু	...	...	...	১০৫
দান	...	...	...	১১৯
আংটি	...	...	...	১৫৫
ত্যাগের দিনে	...	...	...	১৬৩
ধূমকেতু	...	...	...	১৭৫

চিত্রদীপ।

"ব্রহ্মাদ্যাঃ স্তম্ব পর্য্যন্তাঃ প্রাণিনোঽত্র জড়া অপি।
উত্তমাধমভাবেন বর্ত্তন্তে পট-চিত্রবৎ॥".

চিত্রদীপ।

গুরুদক্ষিণা।

১

চণ্ডীতলা একখানি সামান্য পল্লিগ্রাম। গল্পের মধ্যে প্রবেশ করিবার সৌন্দর্য্য ও সংগ্রহ তাহার কিছুই ছিল না। সেই যেমন বঙ্গদেশের ঝোপঝাপ, প্রাচীন ও নবীন ঘন সবুজ বৃক্ষশ্রেণীমধ্যে সুরকি ও ইট খসিয়া পড়া, নোনা-ধরা ছোট ছোট বাড়ী, তাহার একপাশে ভাঙ্গা প্রাচীরের ধারে পানা, কলমী ও কুমুদশোভিত পঙ্কিল পুষ্করিণী, সকালবিকালে সেখানে পল্লিবাসিনীদের জনতায় স্ব ও পরকীয় চর্চ্চা; আর তারপরই দ্বিপ্রহরের অনাহত শান্তি এবং অবিচ্ছিন্ন স্তব্ধতা। গ্রামের বাহিরে গোচারণের প্রশস্ত মাঠ ও দূরবিস্তৃত জলাভূমি আকাশের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত ধূ ধূ করিতেছে। গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিশ্বাস কোন রকমে সেই বৃক্ষবর্জ্জিত সুদূর জলার শেষে পৌছিতে পারিলেই তাহারা হাত দিয়া আকাশের শুভ্র মেঘপুঞ্জ আঁকড়িয়া ধরিয়া নক্ষত্রখচিত আকাশখানাকে নোওাইয়া ফেলিয়া উচ্চ শাখার ফুলের মতন তাহা হইতে নক্ষত্রগুলা অনায়াসেই পাড়িয়া আনিতে পারে। তাই যখন জলার পার হইতে বলদের উপর ভার চাপাইয়া, কৃষকেরা হাটের দিনে শস্য বেচিতে আসে, ব্যবসায়ীরা মেটে পাথর

চালান আনে, অথচ দু'পাঁচটা নক্ষত্র আনে না, তখন তাঁহাদের নির্ব্বুদ্ধিতে বালকদের আর বিস্ময়ের সীমা থাকে না। যেদিন তাহাদের গোপালদাদা বা হারানকাকা গব্যঘৃত বা আখের গুড় লইয়া জলাপারে যাত্রা করে, তাহারা চারিপাশে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া মহা কলরোলে তাহাদিগকে নক্ষত্র-সংগ্রহের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। সেই মাঠের বটগাছতলায় নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে গোচারকের গান যেমনি কেন বেসুরাই হোক্ না, গ্রামের মধ্যে তাহার সুরটুকু বাতাসের শব্দে মিশিয়া বেশ মধুর হইয়াই প্রবেশ করিত। রাস্তার ওপারে ধানের ক্ষেতে সোনার ফসল পাকিয়া উঠিলে কৃষকগণবার সানন্দ-কণ্ঠ উদয়াস্তই গ্রামের উপরের অকাশে ধ্বনিত হইতে থাকিত। এবং কৃষক বালকের আনন্দ কোলাহলে, কৃষকবধূর তাবিজ ও লবঙ্গফুলের রুনুঝুনিতে গ্রামখানি মুখরিত হইয়া উঠিত। এই ত আমাদের পল্লির ইতিহাস।

ভাদ্রমাসের অষ্টমী তিথিতে চণ্ডীতলায় সাতদিন ব্যাপিয়া এক সুদীর্ঘ মেলা কোন্ এক অজানা কাল হইতে বরাবরই চলিয়া আসিতেছিল, তাহার প্রত্নতত্ত্ব এখনও ধরা পড়ে নাই। সে মেলায় কিন্তু বড় জাঁক হয়। তাহাতে গরু মহিষ হইতে কাঁঠাল আনারস, এবং মাটির বেনে পুতুল, আহ্লাদে পুতুল হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণনগরের সরভাজা পর্য্যন্ত সকল দ্রব্যই আমদানী করা হইত। সেই সময় সদা হিল্লোলিত বাতাসে পাল তুলিয়া, কখন বা অবিশ্রান্ত বর্ষাধারায় পরিপূর্ণাঙ্গী নদীটির দুই তীরকে মুখরিত করিয়া নানা দেশ বিদেশ হইতে বোঝাই লইয়া ছোট বড় নানা আকারের নৌকা আসিয়া মেলার ঘাটে ভিড়িতে থাকিত। নিকটবর্ত্তী ও দূরস্থ সহর হইতে

যাত্রার দল, বাঁয়াতবলা বা সৌখীন বাবুর দল হারমোনিয়মের সঙ্গে নিধুবাবুর টপ্পা ও মানভঞ্জনের পালা গাহিয়া, নিশান ও ফুলের মালায় নৌকাকে বিচিত্র বেশে সজ্জিত করিয়া, মেলার দিকে স্রোতের মুখে নৌকা ছাড়িয়া দিত। গ্রামে ও গ্রামপ্রান্তের সেই দিগন্তবিস্তৃত মাঠ-খানাতে তখন যেন একটুখানিও স্থান পড়িয়া থাকিত না।

আজকালও মেলায় তেমনি ধূম হয়। বেশির ভাগ এখন কাঁচের চুড়ি, কাঁচের পুতুল এবং কাপড়ের ফুলে দোকানগুলা ছাইয়া ফেলিয়াছে। পিতল কাঁসার বিখ্যাত দ্রব্য ঠেলিয়া ফেলিয়া, রঙ্গিন রঙ্গিন সুবিচিত্র এনামেল ও কাঁচের বাসন মেঘকাটা পীতাভ রৌদ্রের রশ্মিপাতে অত্যন্ত লোভনীয় দেখাইতেছে। চাষাদের মেয়েরা ঝুটা-জরির পাড়বসান রঙ্গিন ফুলদেওয়া প্রভাবতী সাড়ী ও গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্ চুড়ির জন্য আব্দারে,—এনামেলের বাসনে লোলুপনানা জননীকে বিব্রত করিয়া তুলিতেছে। সওদাগরের এজেণ্টের কাছে কৃষকস্বামী সদ্য শস্য বিক্রয় করিয়া যে অর্থলাভ করিয়াছে, কৃষকপত্নী সম্বৎসরের অন্নচিন্তা ভুলিয়া আয়নাবসান কাঞ্চনমণি চুড়ি ও কেমিকেলের দড়াহারের সহিত দুই চারিখানা কাঁচ এনামেলের বাসনে সেই অর্থ নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রমকাতর ও অর্দ্ধাহারশীর্ণ স্বামীর সহিত ঘোরতর কোন্দল লাগাইয়া দিয়াছে। ছেলের দল গায়ে বেগুনি, গোলাপি বা কাল ছিটের জামা এবং পায়ে ফুল মোজা পরিয়া মুখে সিগারেটে আগুন ধরাইয়া একখানি সিল্কের রুমাল বা একটি ইউডি-কলন, বা এসেন্স্ অব্ রোজ কিনিয়া মস্‌মস্ শব্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিল। এখন মেলার ভারি জাঁক।

এই গ্রামের মধ্যে রামহরি সান্যাল একটুখানি প্রতিপত্তিশালী

লোক ছিলেন এবং তাঁহার কন্যা পদ্মা তাহার সে প্রতিপত্তিটুকুতেও কিছু অংশ লইয়াছিল। তাহার মন্থরগতি, বিনম্র কথা এবং হাসি হাসি মুখখানি গ্রামের প্রাণে একটি স্নেহমাখা করুণার ঢেউ তুলিত। গ্রামের বিজ্ঞ বিজ্ঞা হইতে ছোট ছোট সঙ্গী সঙ্গিনীরা পর্যান্ত এই অচঞ্চল-প্রকৃতি ক্ষুদ্র মেয়েটিকে সমান চোখে দেখিত। কেবল পদ্মা তাহার অপ্রদীপ্ত সুবিশাল স্নিগ্ধ নেত্রের সুকোমল দৃষ্টিপাতেও হরিশ ঘোষের ভাগিনেয় যতীশের অদম্য হৃদয়কে নত করিতে পারে নাই। গ্রামের মধ্যে হরিশ ঘোষের ভাগিনেয় যতীশের মতন আর একটি বালক জন্মিলে গ্রামখানি যে এতদিন কোন্ কালে রসাতলে প্রবেশ করিত, সে বিষয়ে গ্রাম এবং গ্রামান্তরস্থ যাহারা কার্য্যব্যপদেশে এ গ্রামের সহিত সম্বন্ধ রাখিতে বাধ্য, তাহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিত। অনেকেই আবার শুধু এক গ্রাম ছাড়িয়া সাতখানা গ্রামের সহিত তাহার বিক্রমের সংযোগ করিয়া বলিতেন, "সাতগাঁয়েও অমন ছেলে দুটি জন্মায়নি সেই মহাভাগ্য।" এই অতুল্য ভাগিনেয়টিকে লইয়া নিরীহ-প্রকৃতি হরিশ বেচারা বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সকালবেলা কেশবিরল মস্তক ও অনুচ্চ উদর তৈলসিক্ত করিয়া গামছাকাঁধে নদীর পথে বাহির হইলে পুনঃপ্রত্যাগমন পর্য্যন্ত পথের দুই ধারে কত লোকেই যে তাহার কাছে নালিস রুজু করিতে আইসে তাহার সংখ্যা নাই। কেহ আসিয়া বলে, 'খুড়োমশাই, তোমার ভাগ্নে কাল আমার ক্ষ্যাত হ'তে অড়র কলায়ের গাছ অর্দ্ধাঅর্দ্ধি কেটে নিয়ে গ্যাছে।' কেহ বলে, 'আমার কেলে বাছুরটাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেচে কোথাও খুঁজে পাচ্চিনি।' কোন বালক অঙ্গের আঘাত-চিহ্ন প্রদর্শন করিয়া বিচার প্রার্থনা করে। কোন পল্লিবাসিনী

সুশীলা ভগ্ন কলসীর প্রতিশোধে ঘোষগুষ্ঠির চতুর্দ্দশ পুরুষের পারলৌকিক সুব্যবস্থা প্রদান করিতে থাকেন। এইরূপে স্বল্পভাষী সহিষ্ণুশীল মাতুল চারিদিকের আক্রমণে অস্থির হইয়া উঠিতেন। কাহাকেও বা শান্ত করিতে পারিতেন, কাহাকেও বা পারিতেন না—এক এক স্থলে নিজেকেই যথেষ্ট অপমানিত হইয়া আসিতে হইত। কিন্তু এত অত্যাচার ও লাঞ্ছনা সহিয়াও নিজে ভাগিনেয়কে মুখ ফুটিয়া একটি কথাও বলিতে তাঁহার সাহস হইত না। তাহার কারণ যে শুধুই তাহার হস্তে নিগ্রহভোগের ভয় তাহা নহে, সেটাও একটা আংশিক কারণ হইলেও প্রধান কারণ, সে তাঁহার দুর্দ্দমনীয়া দ্বিতীয়পক্ষের পত্নী ভামিনীমণির একান্ত প্রিয়পাত্র।

গলায় পড়া অনাথ ছেলেটা হরিশের প্রথম স্ত্রীর নিকট অত্যন্ত অনাবশ্যক ঠেকিলেও নূতন গৃহিণী ভামিনী তাহার প্রতি অপর্য্যাপ্তরূপে সন্তুষ্ট ছিলেন। সে দত্তদের সবচেয়ে মিষ্ট পেয়ারাগাছের মগডাল হইতে অর্দ্ধপক্ক পেয়ারা ও পোদ্দারদের জামগাছের সার সংগ্রহ করিয়া মাতুলানীর অঞ্চল ভরিয়া দিত। গ্রামান্তর হইতে দুর্লভ কাঁচের চুড়ি, পুতুল ও পুঁতির মালা কিনিয়া আনিয়া তাঁহার চিত্তবিনোদন করিত। এমন কি সন্ধ্যাবেলা যখন বৃদ্ধ হরিশ, বোসেদের চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া পিতামহের আমলের পুরাতন থেলো হুঁকায় কড়া তামাকু টানিতে টানিতে সেই আমলেরি গল্প করিতে থাকিতেন, যতীশ সেই নির্জ্জন সন্ধ্যায় নিঃসঙ্গ কিশোরী মাতুলানীর নিকট পাড়া ঝাঁটাইয়া একপাল ছেলে মেয়ে জুটাইয়া আনিয়া তাস খেলার আড্ডা পর্য্যন্ত জমাইত। ভামিনী এদিকে যাহাই হোক্ অকৃতজ্ঞ ছিল না। সেও সেই উপকারের প্রতিদানে হরিশের প্রহার ও গালি হইতে

তাহার উপকারককে সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া বেড়াইত। একদিন একদিন অত্যাচার অসহ্য হইলে যদি হরিশ তাহাকে কিছু বলিতেন, তাহার পর তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িত। যতীশ রাগ করিয়া মামীর ঘুষ যোগাইত না। ভামিনী সে ক্ষতি বৃদ্ধ স্বামীর উপর দিয়া সুদশুদ্ধ পোষাইয়া লইত। কান্নাকাটি, অনাহার ও আত্মহত্যার ভয়-প্রদর্শনে ব্যাকুল হইয়া হরিশ অবশেষে তাঁহার তরুণী পত্নীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া গুরুতর শপথ করিয়া ফেলিতেন, যে যেমনই কেন পাড়ার নিন্দুক মিথ্যাবাদীরা লাগাক্ না, তিনি তাঁহার শান্ত সুশীল যতীশকে কখনও কিছু বলিবেন না। এইরূপে যতীশের অত্যাচার গ্রামের উপর নির্ব্বিঘ্ন হইত এবং ভামিনীরও খেলা বা পেয়ারা-ভক্ষণে বড় একটা ব্যাঘাত ঘটিত না।

২

সান্যালদের মেয়ে পদ্মা সেদিন যখন স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে গামছা হাতে এলোচুলে বাড়ীর পথে যাইতেছিল, তখন পথের একটা কাঁঠাল গাছের তলায় অনেকগুলি সঙ্গী লইয়া ছেলেদের সর্দ্দার যতীশ কচি আম গাছের মূলোৎপাটন পূর্ব্বক ভেঁপু তৈয়ার করিতেছিল। পদ্মা কৌতূহলের সহিত সেইখানে দাঁড়াইয়া সেই অপূর্ব্ব শিল্পকৌশল দেখিতে লাগিল। সে ইতিপূর্ব্বেও অনেকবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু এই আশ্চর্য্য শিল্পরহস্য-দ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে সক্ষম হয় নাই। যতীশ একে একে অনেকগুলা ভেঁপু তৈয়ারি করিয়া সকলকে বিতরণ করিল, তারপর অবশিষ্ট দুইটার মধ্যে একটা লইয়া সজোরে তাহাতে ফুঁ দিয়া বাজাইয়া বলিল,—

"কি রে তোর একটা চাই নাকি ?"

পদ্মা সাগ্রহে ঘাড় নাড়িয়া হাত বাড়াইল,—যতীশ হাত সরাইয়া লইয়া হাসিয়া বলিল, "ইস্ অমনি দোব বই কি, আগে তুই আমায় কি দিবি তা বল্।"

পদ্মা অপ্রতিভ হইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "কি দোব, তুমি বল না।"

"তোর মা খুব ভাল মিঠে আম্‌সী করে, কুড়িখানা আম্‌সী যদি আন্‌তে পারিস্, তবে ভেঁপু পাবি। নৈলে—এ ভেঁপু তৈরি করা কি না বড্ড সহজ!"

পদ্মার মুখ ম্লান হইয়া আসিল, ভয়ে ভয়ে সে বলিল, "কুড়িখানা আম্‌সী আমি কোথা পাব? মা তো দেবেন না, আমি পাঁচখানা এনে দোব।"

যতীশের দল সাবজ্ঞ হাসি হাসিয়া উঠিল। যতীশ সদম্ভে কহিল, "ইঃ, পাঁচখানা আম্‌সী দিয়ে ভেঁপু নেবেন! মেয়ের ভারি আহ্লাদ যে দেখ্‌তে পাই!"

পদ্মা কাঁদো কাঁদো হইয়া কহিল, "আমি এত কোথা পাব ?"

"কেন, চুরি ক'রে আন্‌বি।" যতীশ অনায়াসে এই পরামর্শ দিলেও মিন্‌মিনে প্যান্‌প্যানে মেয়েটা এই সদ্যুক্তি কিছুতেই গ্রহণ করিল না। এইজন্যই এই দলের সহিত তাহার মিল হইত না। অবশেষে এই পাঁচখানা আম্‌সীর উপর একখানি আমসত্ত্ব স্বীকার করিয়া লুব্ধা বালিকা আনন্দের সহিত ভেঁপু লইল। কিন্তু তেমন বাজিল না দেখিয়া পদ্মা ক্ষুণ্ণ হইলে, যতীশ অগ্রাহ্যের সঙ্গে বলিল,

"কুড়িখানা আম্‌সী দিতিস্‌ ভেঁপুও খুব জোরে বাজ্‌তো, যেমন দান তেমনই দক্ষিণা হবে ত।"

৩

আমরা যে বছরের কথা বলিতেছি, সে বছর অত্যন্ত বর্ষা সত্ত্বেও চণ্ডীতলার মেলায় বড় ধুম লাগিয়াছে। কলিকাতা অঞ্চল হইতে সখের থিয়েটার ও ঢাকা হইতে যাত্রার দল আসিয়া সেই তেপান্তরের মাঠে তাঁবু খাটাইয়া মহাসমারোহে অভিনয় দেখাইতেছে। গ্রামান্তরের লোক গ্রাম ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। কন্‌সার্টের বাজনায় গ্রাম্য গগন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে গ্রামবাসীরা বিস্ময় আনন্দে চকিত হইয়া রহিয়াছিল। ছেলেমেয়েদের মেলাতলায় আনাগোনা এবং মেয়েদের উমেদারির এক মুহূর্ত্ত থামাই ছিল না।

পূর্ব্বদিন বৃষ্টির জন্য অভিনয় বন্ধ ছিল। আজ রাত্রে নূতন থিয়েটারের দল 'ভারতমাতা' অভিনয় দেখাইবে। সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্ব হইতেই দর্শনার্থীরা স্থানার্থী হইয়া অভিনয়স্থলে বিপুল জনতার সৃষ্টি করিতে লাগিল। দূর গ্রাম ও সহর হইতে বড় বড় গাড়ি জুড়ি পল্লিপথ কম্পিত করিয়া অভিনয়স্থলাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। গৃহস্থবাড়ী গৃহবাসিনীরা তাড়াতাড়ি কাজ সারিতে গিয়া এক কর্ম্ম সাতবারেও শেষ করিতে না পারায় রাগিয়া ছেলে পিটাইতেছেন, না হয়ত হাঁড়ি বেড়ি আছড়াইয়া ক্ষোভ মিটাইতেছেন। বধূ ও পল্লিবাসিনী যুবতীর দল বর্ষায় পরিপূর্ণ পুষ্করিণীর তীর মুখরিত করিয়া সকাল সকাল গা-ধুইতে গিয়াছে, কেহ বা তখনও আয়নার সম্মুখে বসিয়া আলবার্ট ফ্যাসানে চুল আঁচড়াইয়া সোনালি জরি জড়াইয়া খোঁপা বাঁধিতেছেন। গহনা

বস্ত্র যাহার যাহা কিছু ছিল বাহির হইয়াছে; যাহার কিছুই ছিল না, সেও দুইগাছা কাঁচের চুড়ি ও একখানা ক্রেপের সাড়ী কিনিয়া মান বজায় রাখিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া কোন প্রবীণ ঠাকুরদাদা তাঁহার সুসজ্জিতা নবীনা নাতিনীকে বলিতেছিলেন, "ওরে বাপু, তোরা থিয়েটার দেখ্‌তে যাবি, না থিয়েটার কর্‌তে যাবি?"

পদ্মার মা মেয়ের লাল ফিতায় মোড়া খোঁপাটি ফিরাইয়া গামছা দিয়া গা মুছাইবার সময় হঠাৎ আবিষ্কার করিলেন, তাহার বামহাতের কাঁচের চুড়ি তিন গাছিই নাই। ক্রোধে বিস্ময়ে রূঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন, 'যতীশদাদা ভেঙ্গে দিয়েছে'। হতভাগা মেয়ে ও অস্থিদাহকারী দস্যুছেলের সম্বন্ধে অনেক বিরক্তি প্রকাশ করিয়া অবশেষে মেয়েকে বলিলেন;—

"বুড়ো মেয়ে! 'রাঁড় হাত' ক'রে দেশশুদ্ধু লোকের মাঝখানে যাবি কেমন ক'রে? যা আট আনা দিয়ে তোর সই যেমন চুড়ি পরেছে, তেমনি 'বুলু' রংয়ের চুড়ি প'রে আয়গে।"

তখনই চুড়ি পরিতে যাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও মায়ের হুকুম পালনে বিলম্ব করা বিপদজনক বলিয়া পদ্মা পয়সা লইয়া নীরবে চলিয়া গেল।

তখন রাস্তায় স্রোতের মত লোক ছুটিয়াছে। বড় বড় গাড়ি আসিয়া মধ্যে মধ্যে কোন একটা দোকানের সম্মুখে থামিতেছে—এবং একটু পরে আবার তাহার সুবেশধারী আরোহীদের লইয়া থিয়েটারের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছে। সিগারেটের গন্ধ বা এসেন্সের সুবাস সকৌতুক উচ্চ হাস্যের সহিত পথের বায়ুস্তরের মধ্যে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত আলোড়িত হইতেছিল। গাড়ির গম্ গম্ শব্দ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত

অনভ্যস্ত কর্ণে বাজিতেছিল এবং চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিতেছিল।

যে দোকানে পদ্মা চুড়ি পরিতে বসিয়াছিল, তাহার সম্মুখে একখানা বড় জুড়ি থামিল এবং তাহার মধ্য হইতে দুইটি বাবু নামিয়া দ্রুতপদে দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিক্রেতা ও ক্রেতাকে চকিত করিয়া তুলিল। দোকানী বালিকার সুগোল হাতখানি ছাড়িয়া নির্ব্বাচিত চুড়িগাছি ভূমে রাখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সৌজন্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—

"আজ্ঞে কি চাই বাবু?"

বাবুদ্বয় দোকানের দ্রব্য সামগ্রীর উপর অনুসন্ধিৎসু নেত্রপাত করিতেছিলেন। একজন বলিয়া উঠিলেন, "এতগুলো দোকান দেখ্‌লাম কোথাও একটা মাত্র দেশী জিনিষ নেই! পরাণ, আমাদের এ কি অবস্থা হ'লো?"

সম্বোধিত বাবুটি একটু মুখ মুচকিয়া মোসাহেবী হাসিমাত্র হাসিল। তাহাতে দুঃখ প্রকাশ পাইল না। দোকানী বাবুদের ভাবভক্তি ভাল বুঝিতে না পারিয়া পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া পদ্মার হাত লইয়া চুড়ি পরাইতে বসিলে, বাবুদের দৃষ্টি তখন তাহার উপর পড়িল। প্রথম বাবুটি তাহাকে কাছে ডাকিলেন, সে ভয়ে ভয়ে কাছে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তুমি বিদেশী চুড়ি পর্‌ছো কেন?"

এ প্রশ্নের অর্থ সে বুঝিল না দেখিয়া আবার বলিলেন, "কাঁচের জিনিষ বিদেশী, জর্ম্মণীতে তৈরি হয়, ও পর্‌লে হাতের জল শুদ্ধ হয় না। তোমার সোনার কি রূপোর চুড়ি নেই?"

বালিকা কুণ্ঠিত ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না'।

বাবু একটুখানি ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তা' হ'লে শাঁখা তো পর্‌তে পার—পর্‌বে?"

বিস্মিতা বালিকা অপরিচিতের প্রশ্নের উত্তরে একটু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

"আচ্ছা, আমি কালই ঢাকা থেকে একজন শাঁখারিকে এখানে আনিয়ে দিচ্চি, তুমি আর কক্ষণো বিদেশী চুড়ি প'রো না। অমন লক্ষ্মীর মতন হাতে ও বিদেশী জিনিষ মানায় না তো!"

এ স্তুতিবাদের অর্থ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলেও পদ্মা মনে মনে একটা আনন্দ অনুভব করিয়া স্বীকার করিল, সে কখন বিদেশী চুড়ি ও পুতুল কিনিবে না।

গাড়ি চলিয়া গেলে, ডানহাতের আধুলিটি আঁচলের খুঁটে বাঁধিয়া পদ্মা উঠিয়া দাঁড়াইল। দোকানী জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা, চুড়ি পর্‌বে না?"

সে ঘাড় নাড়িল, "না।"

দোকানী বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

বালিকা দৃঢ় স্বরে বলিল, "ও বিদেশী চুড়ি।"

দোকানী এবার ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "তা হ'লই বা, দেশশুদ্ধু—পৃথিবীশুদ্ধু সবাই তো পর্‌ছে, তোমার বেলাই বিদেশী? প'রে যাও।"

বালিকা একটি কথাও না বলিয়া দোকান হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

বাড়ী আসিলে মা বলিলেন, "কৈরে, কি চুড়ি পর্‌লি দেখি?

হাত লুকিয়ে রৈলি কেন, দেখা না?" জোর করিয়া কাপড়ে লুকান হাত টানিয়া বাহির করিয়া সক্রোধে বলিলেন, "কৈ চুড়ি কি হ'লো?"

কন্যা কথা কহিল না।

মা গর্জ্জিয়া বলিলেন, "আবার বুঝি সেই মুখপোড়াটা ভেঙ্গে দিয়েছে? দাঁড়াতো দেখাচ্ছি একবার হতভাগাটাকে!" কাঁদো কাঁদো হইয়া কন্যা কহিল, "আমি পারিনি।"

"কেন পরিস্‌নি?"

"চুড়ি যে বিদেশী।"

"অবাক্ কথা! বিদেশী আবার কি?"

পদ্মা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "হাঁ বিদেশী। তিনি যে পর্‌তে বারণ করেছেন।"

মাতা বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "'তিনি' আবার কে লা?"

"সেই খুব বড় গাড়ি ক'রে এসেছিলেন, বলেছেন কাল শাঁখাওয়ালা পাঠিয়ে দেবেন।"

ব্যাপারটা ভাল না বুঝিতে পারিয়া মাতা নিরস্ত হইলেন, তথাপি একটু ঝঙ্কার দিতে ছাড়িলেন না, বলিলেন, "থাক্ সবে সং সেজে, দিচ্চে তোমায় শাঁখা পাঠিয়ে।"

পরদিন এই ব্যাপার কেমন করিয়া সতীশের কাণে উঠিল। সে ইহাতে মহাকৌতুক বোধ করিয়া নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া খুব ভাল একজোড়া কাঁচের চুড়ি ও একটা সিল্কের গাউনপরা মোমের পুতুল কিনিয়া লইয়া সান্নালদের বাগানের বেড়া ডিঙ্গাইয়া একেবারে খিড়কির দ্বারে গিয়া ডাকিল—

"পদ্মা, শুনে যা।"

পদ্মা তখন ছোটভাইকে ঘুম পাড়াইতেছিল। অলঙ্ঘ্য আদেশে বাধ্য হইয়া উঠিয়া আসিল। যতীশ তাড়াতাড়ি উপহার দ্রব্যগুলা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "তোকে দিলুম, এর বদলে তোকে কিছু দিতে হবে না, তুই অম্‌নি নে।" বলিয়াই ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

পদ্মা প্রাপ্য সামগ্রীগুলি ভাল করিয়া দেখিয়া সব বুঝিল। বুঝিয়া মুহূর্ত্তে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্তের জন্য সামান্য একটা যে প্রলোভনের ভাব মনের কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, সেটাকে মুহূর্ত্তের মধ্যেই সরাইয়া ফেলিয়া রুষ্ট স্বরে ডাকিল, "যতীশদা!" যতীশ মজা দেখিবার ইচ্ছায় বেড়ার পাশে গুঁড়ি মারিয়া বসিয়াছিল, উত্তর দিল না। তখন পদ্মা সেই উপহার দ্রব্যগুলা সবেগে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া দুই হাতে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মানুষের জীবনে এমন এক একটা ঘটনা ঘটে যে, একমুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার সমস্ত জীবনের গতি সেই একটি ক্ষুদ্রতর ব্যাপারে এমন অদ্ভুতভাবে, এমনি সহসা সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া দাঁড়ায় যে, চারিদিকের লোকে,—এমন কি নিজে পর্য্যন্ত হয়ত স্বপ্নেও সেকথা কখন কল্পনা করে নাই। এ পরিবর্ত্তন ঘটাইবার সাধ্য শুধু সেই মহাশক্তিময়ী মানব-জীবনের অধিষ্ঠাত্রী ভিন্ন আর কাহারও নাই এবং মানবপ্রকৃতি কেবল সেই এক রহস্যময়ীর শাসনদণ্ডতলেই সম্পূর্ণ পরাজিত। বালিকার সেই অপমানিত বেদনার সুগভীর মর্ম্মোচ্ছ্বাস সেদিন নিষ্ঠুরপ্রকৃতি যতীশের হৃদয়ে কেমন করিয়াই অপ্রত্যাশিতভাবে আঘাত করিল।

বালিকার প্রতিজ্ঞাভঙ্গ সে অন্তরালে বসিয়া দেখিবে এবং তারপ সাম্নে আসিয়া বিদ্রূপ করিয়া বড় হাসিটাই হাসিবে ভাবিয়াছিল এখন তাহার মুক্তবেদনার ব্যাকুল ক্রন্দন তাহার বক্ষে সবেগে যেন লাঠির বাড়ি মারিল। সে এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয় আবার সেই বেড়া ডিঙ্গাইয়া বাগানে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে বালিকার কাছে অপরাধীর মতন আসিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে ডাকিল—

"পদ্মা!" পদ্মা এবার যতীশের সাড়া পাইয়া শান্তচোখে সজল বিদ্যুদগ্নি বর্ষণ করিয়া সক্রোধে মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল, "নিয়ে যাও তামার চুড়ি, নিয়ে যাও তোমার পুতুল, শীগ্‌গির তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও বল্‌ছি, না হ'লে আমি এক্ষুণি ওসব কুচি কুচি ক'রে ভেঙ্গে ফেলে দেব! আমি কি তোমার মতন মিথ্যাবাদী?"

সেই তীব্র তিরস্কার, সুগভীর লাঞ্ছনা সেদিন কিছুতেই যতীশকে ক্রোধে উত্তেজিত করিতে পারিল না। বরঞ্চ তাহা ডাক্তারের ল্যান্সেটের মতন তাহার হাড়ে হাড়ে কাটিয়া গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া মনের মধ্যে একেবারে বসিয়া গেল। লজ্জায় আপাদমস্তক পূর্ণ হইয়া সে অধোমুখে বলিল—

"মাপ কর্ ভাই পদ্মা, আর কক্ষণ এমন কাজ কর্‌বো না, এবার আমায় তুই মাপ কর্।"

এই কথায় অতিবিস্ময়ে পদ্মা সহসা যতীশের মুখের দিকে বাক্‌শূন্য হইয়া চাহিয়া দেখিল, সে এমন উত্তর ও এরূপ স্বর তাহার কাছে আশাও করে নাই। যতীশ একবার অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে তাহার মুখের পানে চাহিয়া ভূমি হইতে চুড়ি ও পুতুল কুড়াইয়া লইয়া

নীরবে চলিয়া গেল। এবার বেড়া ডিঙ্গাইয়া গেল না, সদর দরজা দিয়া ভদ্রলোকের মতনই গেল। মেয়ে বাড়ী আসিলে মা জিজ্ঞাস করিলেন, "বতেটা কি নিয়ে গেল রে? কিছু চুরি করেনি তো?"

পদ্মা বলিল, "না নিজেই এনেছিল, চুড়ি আর পুতুল।"

"এনেছিল কেন?"

গম্ভীর মুখে পদ্মা বলিল, "আমায় দিতে।"

"তবে নিয়ে গেল যে? তুই নিলি নি বুঝি? এমন বোকা মেয়েও বাপু কখন দেখিনি। সকলি যেন কেমন কেমন।"

৪

পরবৎসর চণ্ডীতলার মেলায় শাঁখার চুড়ি ও কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, পিতল কাঁসার বাসন এবং ফরাসডাঙ্গা ও বরানগরের সাদা ও রঙ্গিন সাড়ীর প্রচুর আমদানী আসিয়াছিল। বিদেশী জিনিষের আমদানী ও বিক্রয় চলিলেও এ সমস্ত জিনিষও নিতান্ত অনাদৃত হয় নাই। একটু অবস্থাপন্ন ঘরে কাঁচের চুড়ির পরিবর্ত্তে মেয়েরা শাঁখাটাই পছন্দ করিতেছিল। তবে চাকচিক্য ছাড়িয়া চাষাভুষারা বড় একটা পিতল কাঁসা বা দেশী ধুতি কিনিতে রাজী ছিল না। যে কয়জোড়া মিলের ধুতি ছিল, তাহা একদিনেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু দাম বেশি বলিয়া মিহি ধুতি তেমন কেহ কিনিতেছিল না। অবস্থাপন্নরাও ফরাসডাঙ্গা সাড়ীর অপেক্ষা সেই দরে রঙ্গিন ফুলদার বিজলীপ্রভা সাড়ীতে অধিক ভক্তি প্রদর্শন করিতেছিলেন। দেখিয়া শুনিয়া বাজারের সবচেয়ে বড় দোকানী ভারি চটিয়া উঠিয়া সদলে মিলিয়া একজন বিদেশীবস্ত্র-ক্রেতাকে ধরিয়া খুব পিটাইয়া দিয়া তাহার কাপড়

ছিনাইয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল। ব
করিয়া বলিল—

"বেটা বিদেশী জিনিষের লোভ ছাড়্‌তে পার না! আজ কাপ
পুড়িয়েছি, এবার যেদিন বিদেশী জিনিষ কিন্‌বে, তোমার ঘরে আগু
ধরিয়ে দোব, জানো না;—আমার নাম যতীশ বোস।"

বাস্তবিক, সে বেচারী তাহা জানিত না, অর্থাৎ নাম জানিলেও
নামের মহিমা সে জানিত না; সে নিতান্তই দূর গ্রামের লোক
সে মার খাইয়া, তাই সচরাচর তাহার দরের লোকেরা যাহা করে
তদনুসারেই নিকটস্থ থানায় নালিশ করিতে চলিল। যে সমস্ত
দর্শকগণ দূরে দাঁড়াইয়া তাহার নিগ্রহ দেখিতেছিল, তাহাদের দুএক-
জনকে সাক্ষী মানিতে গেলে, তাহারা সভয়ে কাণে আঙ্গুল দিয়া
বলিল—

"বাপ্‌রে যতিবাবুর বিরুদ্ধে কে কথা কইবে! তোমাকেও
বলি, তুমিও বাপু আর বাড়াবাড়ি ক'রো না, ভাল চাও তো ঘরের
ছেলে এখনও মানে মানে ঘরে ফিরে যাও।"

আর কাহাকেও কিছু না বলিয়া প্রহৃত থানায় গিয়া নিজের
অঙ্গের প্রহারচিহ্ন দেখাইয়া নালিশ করিল।

অনেকখানি বিলম্বে দারোগা সাহেব যথারীতি তদারক উপলক্ষে
দোকানদারগণের নিকট হইতে পাদ্য অর্ঘ মায় দক্ষিণা গ্রহণ পূর্ব্বক
'প্রমাণ নাই' বলিয়া চলিয়া গেলেন। ইহার পরেই একখানা জুড়ি
গাড়ি আসিয়া যতীশের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং তাহা হইতে
একজন যুবক নামিয়া দোকানে প্রবেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"একি কাণ্ড করেছ?"

যতীশ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আপনি এরমধ্যে শুনেছেন? তা মন্দই বা কি ক'রেছি বলুন?"

যুবক বলিলেন, "মন্দ নয়! বল কি যতীশ! ভারি অন্যায় কার্য্য করেছ। আমরা যে কাজ নিয়েছি, তা' তো জবরদস্তির কাজ নয়, অনুরোধে যে অন্যের হৃদয় গলাবে, ভক্তিতে যে পরের মন টলাবে, সেই মাতৃভূমির সন্তানের কায করবে। দেশের জন্য যে হৃদয় উৎসর্গ করবে, সে হৃদয়মধ্যে নিষ্ঠুরতা পাশববৃত্তিকে স্থান দিতে পার্ব্বে না, তাকে করুণায় মমতায় দেশ গলিয়ে দেশবাসীকে আপন ক'রে নিতে হবে। ছি ছি অমন কাজ আর কখন ক'রো না। আমাদের এখন অসীম ধৈর্য্য সহকারে অল্পে অল্পে দিনে দিনে সযত্নে সহজ পথে অন্যের হৃদয় জয় ক'রে নিজের এই আরব্ধ কার্য্যটি সর্ব্বাঙ্গীণ পূর্ণতার পথে অগ্রসর ক'রে নিতে হবে। এ কাজ তো সহজ নয়। এ কাজে ধনীদরিদ্র উচ্চনীচ সবাইকে যে প্রেমে পুণ্যে এক করতে হবে; এ ধর্ম্মের কর্ম্ম অধর্ম্ম দিয়ে, অত্যাচারের আগুন জ্বালিয়ে কখনই হবার নয়। মিষ্ট কথা, সংব্যবহার এবং অবিচ্ছিন্ন ধর্ম্মপথ এই তিনের সাহায্য ভিন্ন উল্টা পথে যা করতে যাবে, জেনো তাঁতে সফলতার পরিবর্ত্তে ব্যর্থতাকেই টেনে আনবে। বুঝতে পেরেছ ভাই, তোমার কাজটি একটুও ভাল হয় নি।"

যতীশ নতমস্তকে অপরাধ স্বীকার করিল। তখন তিনি বলিলেন, "সে গরীব লোকটিকে কাপড়ের জন্য পাঁচ টাকা ও গাড়ি ভাড়া ব'লে কিছু আমি দিয়েছি। দারোগা সাহেবও কিছু পেয়েছেন শুনলুম। কিন্তু সাবধান এবার যেন অল্পে স্বল্পেই রক্ষা পেয়ে গেলে, বরাবর এমন পাবে না। এ কথা যদি একবার সহরে পৌঁছায়, ম্যাজিষ্ট্রেট

সাহেবের কাণে যায়, আমাদের স্বদেশী প্রচার সম্বন্ধে ওঁদের এ অহেতুক বিদ্বেষ জন্মে থাক্‌বে, সকলেই ওঁরা দোষ দেখ্‌তে পাবেন, ত খেল ক'রে আর কোন কাজই হবে না। একেতো স্বদেশী প্রচারকে অনেকেই না বুঝে ভেবে রাজ-বিদ্রোহের চিহ্ন, বি বাদীদের লক্ষণ মনে ক'রেও থাকেন।"

সেদিন লজ্জিত যতীশ থিয়েটারের আমোদ পরিত্যাগ ক অনুতপ্ত চিত্তে স্বহস্তে-লাঞ্ছিত-ব্যক্তির সন্ধানে বাহির হইল। এ ছাড়িয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে তাহাকে অনুসন্ধানে বাহির করিয়া যত যোড়হাতে একেবারে বলিয়া উঠিল—

"ভাই মাপ কর, আমি নিতান্ত পাষণ্ড, আমার পাশব ব্যবহ তুমি এবারকার মতন ক্ষমা কর।"

লাঞ্ছিতের নাম কেবল দাস; সে ... এই অত্যদ্ভুত ব্যবহারে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কিছু ...স্থ হইয়া গেল। প্রথমে ইহা সত্য কি ব্যঙ্গ তাহা বুঝিয়াই উঠিতে ...ল না; আবার কো নূতন উপদ্রব আগতপ্রায় ভাবিয়া একা... কাতর হইয়া শশব্যস্তে বলিল, "না বাবু তুমি ত কোন কসুর কর নি, সে আমি সব ভুলে গেছি। তা' ছাড়া আমরা গরীব গুর্‌বো লোক আমাদের অ গায়েও লাগে না।"

শেষের কথাটা বলিতে বেচারার মুখের ভাবটা একটু শোচনীয় হইয়া আসিল। কারণ 'গরীব লোকদের গায়ে' না লাগিলেও এক্ষেত্রে যতীশের বজ্রমুষ্টি তাহার গায়ে বিলক্ষণই লাগিয়াছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গে এখনও তাহার কন্‌কনানি বন্ধ হয় নাই, এইমাত্র সে তাহার পত্নীকে চুণহলুদ গরম করিতে আদেশ দিয়াছে। যতীশ তাহার ভয়ভক্তির

প্রাবল্য দেখিয়া বেশিক্ষণ তাহাকে এই বিপদাশঙ্কিত সঙ্গদান দ্বারা সন্ত্রস্ত না রাখিয়া যাইবার সময় বলিয়া গেল,—"চণ্ডীতলায় গেলেই তুমি আমার কাছে যেও, আমাকে ভয় কর্‌বার তোমার আর কোন কারণ নেই। আমার গুরু আমায় আজ জ্ঞান দিয়েছেন।"

৫

সেদিন যতীশ যখন ফিরিয়া গিয়া ঐক্যতান বাদনের শব্দে মুখরিত জনহীন পল্লীগৃহে নিজের পুরাতন তক্তপোষের উপর জীর্ণশয্যায় দেহ ঢালিয়া দিল, তখন নিজেকে যেন অপর আর এক ব্যক্তি বলিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল। জীবনের সহস্র ছোট বড় হৃদয়হীনতা আজ তাহার কাছে অক্ষমণীয় অপরাধের আকার ধারণ করিয়া তাহার চিত্তকে কেবলি খোঁচা মারিতে লাগিল। সেইসঙ্গে নিজেকে এক বৎসরে অনেকখানি পরিবর্ত্তিত বলিয়া মনে হইবামাত্র হঠাৎ সে পরিবর্ত্তনের কারণটাও তাহার মনে পড়িয়া গেল। সেই এক দ্বিপ্রহরের মুক্ত রৌদ্রে এক কল্যাণময়ীর রুদ্রদৃষ্টি তাহার রুদ্ধ হৃদয়দ্বারের কপাট খুলিয়া দিয়াছিল। সে দিন আজ তাহার নিকট জীবনের একটা পুণ্যাহ বলিয়া মনে হইল। তারপর আজ আবার পুণ্যকার্য্যের আবরণে গুরুতর পাপানুষ্ঠান দ্বারা হীন বুদ্ধিতে সে যখন নিজেকে অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিতেছিল, পরপীড়নের দ্বারা মাতৃসেবা-ব্রত যখন কলঙ্ক-কালিমায় রঞ্জিত করিয়া ফেলিয়া পথভ্রষ্ট হইয়া বিপথে ছুটিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন আর এক দৈবপ্রেরিত দেবদূতের সরল উপদেশ দেবতার আশীর্ব্বাদের মতই তাহাকে প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিয়া গেল। যতীশ উঠিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ ভাবিতে লাগিল। তাহার জীবনের মধ্যে এই

দুইটি আবির্ভাবকে সে দেবতার প্রেরণা বলিয়া মনে করিয়া আত্ম-গৌরব অনুভব করিতে লাগিল। মনে মনে তাঁহাদের শতবার প্রণাম করিয়া বলিল, "তোমরাই আমাকে নবজীবন দিয়াছ, তোমরাই আমাকে মানুষ করিয়াছ, দেখো সে দান আমি আর অপব্যয় করিব না। দেশের জন্য এজীবন উৎসর্গ করিয়াছি, এবার পথও করিলাম।"

জমীদার প্রমোদকিশোরের বিবাহে সেইবৎসর ফাল্গুন মাসে চণ্ডীতলায় অত্যন্ত সমারোহ হইল। কিন্তু সে বিবাহে বাজি বাজনা ও আলোকের প্রাচুর্য্য মোটেই নাই দেখিয়া গ্রাম ও গ্রামান্তরের ভদ্রলোকেরা অবাক্ হইয়া গেলেও এবং আকাঙ্ক্ষিত যাত্রা থিয়েটার বা নাচনা গাওনা না থাকায় পল্লীবাসিনী রূপসীরা যথেষ্ট অসন্তোষ প্রকাশ করিলেও, অনাথ আতুর দীনদরিদ্র সমস্বরে কুমার প্রমোদকিশোর ও নববধূ পদ্মাবতীর জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিতে কোন ত্রুটি করিল না। সাত গ্রামের হিন্দু মুসলমান প্রজা এই উপলক্ষে সমান যত্নে আহার বস্ত্র এবং সে বৎসরের মত খাজনা রেহাই পাইয়াছিল ; এবং নানা দিগ্‌দেশাগত অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সাধু সজ্জন সসম্মান বিদায় পাইয়া বরবধূকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছিলেন। এই সঙ্গে সকলেই এক বাক্যে বলিল ;—জমিদারের নূতন কর্ম্মচারী এবং এ বিবাহের ঘটক সতীশ বোসেরই চেষ্টা ও যত্নে এই শুভকার্য্য এরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইল। এমন প্রভুভক্ত কর্ম্মঠ যুবক এ অঞ্চলে আর নাই!

চণ্ডীতলার বাজারে সমস্ত দোকানীরা সেদিন স্বেচ্ছায় বিদেশী দ্রব্য বিক্রয় বন্ধ রাখিয়া বলিল, "যা জিনিষ পত্র মজুদ আছে সেগুলো অবশ্য বেচে ফেল্‌তে হবে, কিন্তু আজ এই শুভদিনে অশুভ কর্ম্মটা আর কর্‌বো না।"

বর চতুর্দ্দোলে আসিয়া বসিলে পুরবাসিনীরা রক্তাম্বরা মাল্যচন্দন-চর্চ্চিতা কন্যাকে তাঁহার পার্শ্বে বসাইয়া দিয়া গেলে সানাইয়ের বাঁশি বিদায়ের সুরে যেমনি তান ধরিয়াছে, এমন সময়ে কার্য্যে অপরিশ্রান্ত যতীশ কোথা হইতে ভিড় সরাইয়া নবদম্পতীর সম্মুখে আসিয়া গলায় বস্ত্র দিয়া তাঁহাদের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

বর একটু ব্যগ্রভাবে সরিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া তুলিলেন, ঘোমটার মধ্যে নববধূ পদ্মা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল।

যতীশ সজলনেত্রে উভয়ের পানে চাহিয়া গদ গদ কণ্ঠে কহিল—

"প্রমোদবাবু, পদ্মা দিদি, তোমরাই আমার জীবনের গতি ফিরিয়ে দিয়েছিলে, তোমাদের সে অপরিশোধ্য ঋণ আজ আমি শোধ করলুম। তোমাদের এই অধম শিষ্যকে তোমরা আশীর্ব্বাদ কর যেন কখন সে আর মতিভ্রষ্ট না হয়। যতই অধম হোক্ সে গুরুদক্ষিণাটা কিন্তু ভালই দিয়েছে!"

পরাজয়।

১

তখন সবেমাত্র প্রভাত হইয়াছিল। সমুদ্রের নীল জলে নবোদিত সূর্য্যের গোলাপী রশ্মি সবেমাত্র পতিত হইয়া তাহার অনন্ত নীলকে বৈদূর্য্যমণিপ্রভ করিয়া তুলিয়া ক্রমশঃ তাহার চারিপাশে স্বর্ণচূর্ণ ছড়াইয়া তাহাকে আরও উজ্জ্বল করিতে করিতে যেন একখানি শুভ্র ইন্দ্রধনুর ন্যায় শোভা ধারণ করাইল। চলন্ত মেঘের মত সাদা পাল তুলিয়া ছোট নৌকাগুলি শুভ্র তরঙ্গের মুখে ভাসিতে লাগিল।

তীরে তালকুঞ্জে শ্যামল দূর্ব্বাসনে বসিয়া নবীন চিত্রকর অতৃপ্ত নেত্রে সমুদ্রের দিকে চাহিয়াছিল। বালুকাময় বেলার উপর শ্বেতফেনপুঞ্জ কিরীটী তরঙ্গ সকল মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া মধুর মূর্চ্ছনা গাহিতেছিল। পাখীরা তাহাদের সদ্যোনিদ্রোত্থিত অলসনেত্র মেলিয়া আধসুপ্ত আধজাগ্রৎ জগতের পানে চাহিতেছিল। চিত্রকরের পার্শ্বে তাহার অর্দ্ধসমাপ্ত চিত্র "উষা" ও তাহার অঙ্কনসামগ্রী সকল স্থাপিত; চিত্রে বর্ণ ফলাইতে ফলাইতে বিমুগ্ধ চিত্রকর চিত্রাঙ্কন ভুলিয়া ভাববিভোর চিত্তে চাহিয়া আছে।

ক্রমে সূর্য্যের তেজ একটু খর হইল, পাখীরা প্রভাতী গাহিয়া চারিদিকে ছুটিল, নবীন চিত্রকর সচকিত নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া চিত্রখানা টানিয়া লইল। তখন ঘাসের উপর শিশিরবিন্দু শুকাইয়া গিয়াছে। চিত্রের মধ্যে ঝলমল অর্দ্ধালোকে শিশিরসিক্ত কুসুমদলে

দাঁড়াইয়া উষা-প্রতিরূপা বালিকা সহাস্যাননা! অতৃপ্ত নেত্রে যুবক আলেখ্যলিখিত প্রতিমার পানে চাহিয়া চাহিয়া মুগ্ধ কণ্ঠে উচ্চারণ করিল, "রেবা!" "কি?"

চিত্রের প্রতিমা সেই মুহূর্তে যেন শরীর গ্রহণ করিয়া ছায়াচ্ছন্ন তালীবনান্তরাল হইতে চঞ্চলচরণে বাহির হইয়া আসিল!

"তুমি এসেছ? অনেক দেরী হ'য়ে গেছে, মনে হচ্ছিল—"

"কি?"

"বুঝি এলে না।"

"না এসে কি করি, তুমি আমার জন্য ভোর থেকে ব'সে আছ, তাই আমারও মন কেবলি আস্‌বার জন্য অস্থির হয়, তবুও কাজ শেষ করতে দেরী হ'য়ে গেল।"

"ছাই কাজ!" রেবা কলস্বরে হাসিয়া "কাজ ছাই-ই হোক্ পাঁশই হোক্ না করলে চলে কি? বাড়ীওয়া এমন না! আচ্ছা এখন নাও আমি বস্‌ছি; কিন্তু এই দেখ—এখ সি পাচ্ছে!"

যুবক তুলি ধরিয়া হাস্যচঞ্চলা বা র মুখে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল; তাহার মুখে চোখে হাসির স যেন প্রস্রবণের ত চারিদিকে আনন্দ ছড়াইতেছিল। সেও অকস্মাৎ হাসিয়া ফলিল, "এমন ক'রে যদি কেবল হাসাস্ রেবা তা হ'লে তো কান কাজই হয় না। যাঃ!" এই বলিয়া সে তুলিটা ফেলিয়া য়া তাহার হাস্যোচ্ছ্বাসসুন্দর মুখখানার দিকে প্রীতিপ্রফুল্লনেত্রে াহিয়া থাকিল।

"আচ্ছা বিভূতি বাবু! তুমি বাড়ী গেলে ছবি আঁকা হবে কি 'রে? অন্য 'মডেল্' রাখ্‌বে?"

বিভূতি এই কথায় যেন চমকিয়া উঠিল। এ প্রশ্ন যেন তাহারি অন্তরের প্রশ্ন! তাহার মুখের ভাব সহসা গম্ভীর হইয়া উঠিল, কহিল, "তাই ভাব্‌চি রেবা তখন কি হবে। আমার সঙ্গে তুমি কেন সেথানে চল না! যাবে?"

রেবা মৃদু হাস্যের সহিত ঈষৎ চিন্তিতভাবে কহিল, "আমি,—সেথানে? না। যদি কেউ কিছু বলে?"

"কে, কি বল্‌বে?"

কে, যে কি বলিতে পারে সে কথা সে ভাল বুঝে না, কিন্তু কিছু যে কথা উঠা সম্ভব শুধু এই একটুখানি অস্পষ্ট ধারণা তাহার আছে। সে ভাবিতে ভাবিতে উত্তর করিল, "এই বল্‌বে যে এ আবার কোথা থেকে এলো?"

"তা বল্‌তে হয় বলুক্ আমি তাদের উত্তর দিতে পার্‌বো, তুমি চল, না, তুমি আমার সঙ্গে চল রেবা—তা না হ'লে আমিও যাব না।" রেবা বিস্ময় বোধ করিল, এসব তো হাসি খেলার সুর নয়! তবে সত্যই তাহাকে যাইতে হইবে নাকি? সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি তাদের কি বল্‌বে?"

"বল্‌বো? বল্‌বো, রেবা আমার স্ত্রী, আমি ওকে বিবাহ কর্‌বো ব'লে নিয়ে এসেছি।" বনবিহঙ্গিনী বিস্ময়ে অস্ফুটধ্বনি করিয়া বিস্ফারিতনেত্রে প্রস্তাবকারীর মুখের দিকে চাহিল। একি পরিহাস!

২

বিভূতি বড়লোকের ছেলে। মায়ের সাধ শীঘ্র শীঘ্র সে একটি ডানাকাটা পরী ঘরে আনিয়া দিয়া মাতৃঋণ শোধ করে; কিন্তু ছেলে

একেবারে ঘোর বিবাহদ্বেষী। সে গ্রামের বিদ্যা, সহরের বিদ্যা শেষ করিয়া ললিতকলার সাধনায় ইদানীং মন দিয়াছে; সে বলে বিবাহের সময় এখনও তাহার হয় নাই। যেদিন তাহার মনের মত পাত্রী মিলিবে সেদিন নিজেই সে বিবাহের উদ্যোগ করিতে মাকে খবর দিবে, এখন তিনি নিশ্চিন্ত থাকুন। বৎসরের পর বৎসর কাটিল কিন্তু এ পর্য্যন্ত মন কোন বিবাহমালা-ধারিণীকে নিজের মত করিয়া লইল না, কাজেই এখনও সে "আইবুড়"।

বন্ধু প্রমথনাথ দূরে দাক্ষিণাত্যে ... শিল্পশিক্ষায় যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। বন্ধু বন্ধুর নিমন্ত্রণে আসিয়া দেখিল ... সে এক মঞ্চোপরি স্থাপিতা বীণাবাদিনী বাণীর প্রতিমা গঠন করিতেছে, আর তাহারি জীবন্তপ্রতিমা স্বল্পমাত্র দূরে দাঁড়াইয়া। সে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কে?"

"দেখ্‌তেই পাচ্চ 'মডেল'।"

"মডেল? ছোটলোকের ঘরের মেয়ে?"

"না ঠিক তা নয়, গরীব ব্রাহ্মণের মেয়ে, এখন অন ... । ... র বাড়ী থাকে, তাকে কিছু দিয়ে আমি মডেল করেছি চেহারাখ... ভাল, না?"

"কি সুন্দর মূর্ত্তিটি! আহা এর এত দুঃখ!"

"মন যে একবারেই গ'লে গেল, দেখ সাবধান! এত করুণাও ভাল নয়!"

বিভূতি ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিল, "ছিঃ শুন্‌তে পাবে যে।" "ওঃ ঐ রেবা? ও কিছুই বুঝবে না, মেয়েটা ভারি বোকা!"

"হ্যাঁ দেখ্‌লেই বোঝা যায় খুব সরল।"

প্রমথ কহিল, "ও যাই বল, মোদ্দাৎ সংসারানভিজ্ঞ এমন দেখনি। এই জন্যে আমার ভয় হয় কোন্ দিন কোন্ পাপিষ্ঠের ফাঁদে প'ড়ে না জন্মের মত ব'য়ে যায়।"

ব্যথিত নেত্রে বিভূতি তাহার নীরব হাস্যোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। 'মডেল' এতক্ষণ ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া অপাঙ্গে আগন্তুককে দেখিতেছিল, এবার আর ধৈর্য্য রক্ষা করিতে না পারিয়া সোজা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—"তুমিও খড়ির পুতুল গড়্‌বে? আজ কিন্তু বেলা হ'য়ে গেছে আমি আর দাঁড়াতে পার্‌ব না, কাজ কর্‌তে যাব।"

মুগ্ধ বিভূতি জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ তোমার?" "কাজ কি জানো না?" বলিয়া সে হাসিল; "এই জল তোলা, বাসন মাজা, ঝাঁটপাট দেওয়া—এই সব।"

বিভূতি কহিল, "আহা!"

প্রমথ তাহার মডেলকে একটা ধমক দিল, "স্থির হও রেবা! পায়ের আঙ্গুলগুলি ঠিক সমান ক'রে রাখ।"

বিভূতি মাতাকে পত্রে জানাইল সে এইখানেই কিছুদিন চিত্রাঙ্কন শিক্ষার্থ প্রমথর নিকট থাকিবে, স্থান বড়ই ভাল। পত্র পাঠান্তে মাতা মোক্ষদায়িনীর দুই চক্ষু কপালে উঠিল। গ্রাম ছাড়িয়া যাহাকে গ্রামান্তরে যাইতে দিতে সাতবার হরির লুট মানত করেন, সে ছেলে কোন্ বিদেশে চলিয়া গেল! আবার সেইখানেই সে থাকিবে? প্রথমে তিনি রাগিয়া বাড়ী মাথায় করিলেন, পরে ঠাকুরঘরে গিয়া মাথা কুটিয়া রক্তপাত করিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, "হে ঠাকুর! আমার ছেলে ফিরিয়ে আন. আমার দুধের বাছা কোন্ দুঃখে বিদেশে বিবাগী হ'য়ে প'ড়ে থাকে?

কিন্তু ছেলে তথাপি ফিরিল না। মা কান্না-কাটি ও একাদশীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া শেষে নিষ্ফল আক্রোশে 'ললিত কলার' সমূল ধ্বংস কামনায় প্রত্যহ জপ সংখ্যা এক সহস্র পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন। এমনি করিয়া বৎসর ঘুরিল। অনেক ভাল ভাল বিবাহ সম্বন্ধ আসিয়া ফিরিয়া গেল, ছেলে ঘরেই ফিরে না, বিবাহ করিবে কে? পত্র আসে "আর দু'মাস দেরি কর, কার্য্য সফলপ্রায়।"

ইতিমধ্যে প্রমথ তাহার ছোট ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে দেশে চলিল। অনেক অনুরোধ উপরোধেও বিভূতিকে সে সাথী করিতে পারিল না। কিন্তু প্রমথর নিকট হইতে পুত্রের সংবাদ গ্রহণকালে মোক্ষদায়িনী এমন কিছু সংবাদাভাষও পাইলেন যাহাতে আবার একটা কান্নাকাটনা উপবাস-ত্রিরাত্রের পালা পড়িয়া গেল এবং পালা সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বেই বিভূতির নিকট তারে সংবাদ পৌছিল যে তাহার মায়ের কঠিন পীড়া, শেষ সাক্ষাতের ইচ্ছা থাকিলে যেন শীঘ্র চলিয়া আইসে।

৩

বিভূতি নিজের মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল যে সে অনাথা ব্রাহ্মণকন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবেই, তাহাতে তাহার ভাগ্যে যাহা হইবার হউক। এজন্য তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হয়, সে না হয় দেশের পল্লীভবন ত্যাগ করিয়া কলিকাতার জনস্রোতের মধ্যে নূতন গৃহপ্রতিষ্ঠা করিবে,—সে গৃহের গৃহলক্ষ্মী যখন লক্ষ্মীরূপিণী রেবা, তখন তাহার আর কি চাই?

রেবা আসিয়া তাহার সঙ্গীতময় হাস্যলহরে সে চিন্তামুকুলের

পাপ্‌ড়িগুলি যেন খুলিয়া দিল। "তুমি এখন পর্য্যন্ত ঘরের মধ্যে একা ব'সে আছ; ঘুমুচ্চ নাকি ?"

"না রেবা ঘুম আমার চোখে কতদিন আসেনি তুমি তার কি জান্‌বে? এসো আমার সাম্‌নে একবার দাঁড়াও, আমি তোমায় ছ'চোখ ভ'রে শুধু দেখি!"

বিস্ময়ের হাত ধরিয়া কৌতুক যেন সেই ছুটি বিশাল চোখের ঘন কালো তারার মধ্যে পাশাপাশি দাঁড়াইল। রেবা একটুখানি অগ্রসর হইল। "এম্‌নি ক'রে ছবি আঁক্‌বে আবার?"

অতৃপ্তনেত্রে চাহিয়া চিত্রকর কহিল, "না রেবা, ও মুখের চিত্র এই বুকেই থাক, বাহিরে ও ব্যর্থ চেষ্টা আর নয়! এখন এসো তুমি আমার কাছে এসো, তুমি আমার হও,—আমার ঘরে চল।"

"ফের সেই কথা? তুমি খালি খালি পাগলের মতন ওসব কি বল? আমার গয়না নেই, ভাল কাপড় নেই, আমি তোমার বউ কেমন ক'রে হব,—লোকে যে হাস্‌বে!"

"আমি সে সব তোমায় দেব, কেউ তাতে হাস্‌বে না, তুমি কি আমায় ভালবাস না?"

রেবা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, বাসে। "তবে আবার ওসব বল্‌চ কেন? আর দেরি নয়, ছএক দিনের মধ্যেই বিয়ে হ'য়ে যাক্।" এই বলিয়া আবেগোত্তেজিত বিভূতি তাহার হাতটা ধরিল। "এখন ব'স, ছ'জনে পরামর্শ করি কেমন করে—" সহসা হাত ছাড়াইয়া লইয়া রেবা সভয়ে ছই পা পিছনে সরিয়া গেল। "না বিভূতি বাবু! কাজ নেই সবাই যদি তোমায় বকে?" বিভূতি ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল, "তুমি সবার কথাই কেবল ভাব্‌চ, আমার জন্য একবারও ভাব্‌চ না?

রেবা! যদি তুমি আমায় ত্যাগ কর, আমি ওই সমুদ্রে ডুবে মরবো!"— সভয়ে বালিকা তাহার দিকে সরিয়া দাঁড়াইল, ভীতিপূর্ণ স্বরে কহিয়া উঠিল, "না তুমি ম'রো না; আমি তোমার কথাই শুনবো"—"তবে আজ কিম্বা কালই আমাদের বিয়ে হ'য়ে যাক্, প্রমথ এলে হয়তো সে এতে বাধা দেবে।"

সেই দিনই হঠাৎ প্রমথ বাড়ী হইতে ফিরিল। সংবাদটাও তাহার নিকট গোপন রহিল না। সে ঘোর আপত্য করিয়া কহিল, "একি শুনি? এ অসম্ভব!"

বিভূতি ধীরকণ্ঠে কহিল, "জগতে কিছুই অসম্ভব নয়, আমি চিত্ত স্থির করেছি।"

"সে কি বিভু? দেশে মা আছেন, সমাজ আছে, এমন কাণ্ড কি করে? নিজের দেশে সুন্দর কনের অভাব কি?"

দৃঢ়কণ্ঠে বিভূতি উত্তর করিল, "কেন মিথ্যা উপদেশ দিবে? ঢের তো দিয়েছ আগেও। ও সব কথাই আমি জানি, কিন্তু আবার এও জানি যে রেবাকে না পেলে আমার জীবন অন্ধকার—বেঁচে থাকা বিড়ম্বনামাত্র।" ক্ষুণ্ণ প্রমথ সবিষাদে কহিল, "তবে আর কি বল্‌ব? মোহটা ত্যাগ কর্‌লেই ভাল কর্‌তে!"

"প্রমথ! ছিঃ, তুমি একে মোহ বল? জান না তার 'পরে আমার ভালবাসা কত গভীর।"

সেইদিনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবার বাড়ী হইতে আরজেণ্ট টেলিগ্রামে সংবাদ আসিল, "তোমার মা মৃত্যুশয্যায়; শেষ সক্ষাতের যদি ইচ্ছা হয় অবিলম্বে আইস।" এ আবেদন অতি বড় পাষণ্ডও উপেক্ষা করিতে অক্ষম। রাত্রের গাড়িতেই বিভূতি বাড়ী রওনা হইল।

৪

বিভূতি চলিয়া গেলে, প্রমথ রেবাকে ডাকাইয়া আনিল। সেই তাহাদের চিত্রশালা, সেখানে গৃহভিত্তির চারিধারে, আসনে, মঞ্চে; পটে; প্রতিমায় তাহারি সুললিত মূর্ত্তিটি অর্দ্ধস্ফুট মুকুলের মত ফোটো ফোটো হইয়া আছে। বেত্রাসনে বসিয়া নত মস্তকে ভূমে ক্রুসটা ঠুকিতে ঠুকিতে প্রমথ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রশ্ন করিল, "বিভূতি তোমায় বিয়ে কর্‌তে চায়,—না রেবা?" রেবা মস্তক হেলাইয়া জানাইল যে 'হাঁ', তারপর ঈষৎ সঙ্কুচিত ভাবে সে প্রশ্ন করিল, "আপনি কি ক'রে জান্‌লেন? একথা কাউকে বল্‌তে তিনি বারণ করেচেন, আমি যে ব'লে ফেল্‌লাম?"

প্রমথ কহিল, 'তা হোক্, তাতে কিছু ক্ষতি হয় নি; তাকে বিয়ে কর্‌তে তোমারও কি ইচ্ছা আছে?" মারাঠি বালিকা আবার নীরবে নিজের সম্মতি জ্ঞাপন করিল। প্রমথ কিছু বিপন্ন বোধ করিল, একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "কিন্তু তাতে ওর ভারি ক্ষতি হবে, ওর মা কাঁদ্‌বে, সকলে ওকে ত্যাগ কর্‌বে, নিন্দা কর্‌বে,—তবু তুমি ওকে বিয়ে কর্‌বে?"

এবার মুখ তুলিয়া বালিকা প্রশ্নকর্ত্তার মুখের দিকে ব্যাকুল প্রশ্নপূর্ণনেত্রে চাহিল। প্রমথ কহিল, "বুঝ্‌তে পারচ না; তুমি গরীব মারাঠির মেয়ে, সে বাঙ্গালী ভদ্রঘরের সন্তান।"

এই কথায় যেন অনেকখানি দুর্ভাবনা দূর হইয়া গেল, এমনি সহজ ভাবে হাসিয়া সে কহিল, "তিনি বলেছেন আমায় অনেক গহনা দেবেন, আমি তো তখন গরীব থাক্‌বো না!"

"হা নির্ব্বোধ! একে আমি কেমন ক'রেই বা বুঝাবো! না রেবা তুমি জানো না এই বিয়েতে তার তুমি কি সর্ব্বনাশ করতে যাচ্ছ। শুধু তার নয় তার বংশের, তার পিতৃপুরুষের, তার ভবিষ্যৎ বংশধরদের পর্য্যন্ত কলঙ্ক, অপযশ, অপমান! তবুও এ বিয়ে করবে?"

রেবার চিরপ্রফুল্ল মুখখানি শুকাইয়া গেল; সে আতঙ্ককম্পিতকণ্ঠে ব্যাকুলভাবে তৎক্ষণাৎ কহিল, "না!" তারপর প্রমথর গম্ভীর দৃষ্টি হইতে সভয়ে দৃষ্টি নামাইয়া লইল।

তখন সন্তুষ্টচিত্তে প্রমথ কহিল, "তবে এক কাজ কর রেবা,—এখান ছেড়ে তুমি কোথাও, কোন দূর দেশে যাও,—তোমার কি কেউ কোথাও নেই?"

রেবা নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িল। তাহার ঘন চোখের পাতা তখন ভারি হইয়া আসিয়াছিল।

"তবেই তো! আচ্ছা এক কাজ কর, সোলাপুরে আমার একটি আত্মীয় স্ত্রীপুত্র নিয়ে আছেন; আপাততঃ সেইখানেই তুমি যাও; তারপর আমি তোমার যা হয় ভাল একটা ব্যবস্থা ক'রে দেব। কেমন যাবে তো?"

রেবা আবার শিরঃসঞ্চালন করিল, তাহার পেলব তুলার মত কোমল অধরোষ্ঠ ঈষৎ কাঁপিতেছিল। "তবে আর বিলম্ব কি? আজই যাও। তোমার বাড়ীওয়ালীকে আমি রাজী করিয়েছি, রাত্রের মধ্যেই বেরিয়ে পড়—"

সহসা এই কথায় চমকিয়া উঠিয়া বালিকা মুখ তুলিল। ব্যাধের শর হরিণীকে যে এখনি বিঁধিবে, তাহা সে বুঝি বুঝে নাই! তার এই যন্ত্রণা ব্যথিতভাবে প্রমথ একটুখানি থতমত খাইয়াও

জোর করিয়া বলিল, "হ্যাঁ রেবা আজই যাও, দেরি করা ভাল নয়।"

এবার বালিকার বিশালনেত্র হইতে টপ্ টপ্ করিয়া জল ঝরিয়া তাহারই পায়ের তলার মাটিতে পড়িয়া গেল। অকস্মাৎ সে দুই হাতে মুখ ঢাকা দিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রমথ হতবুদ্ধির মত তখন নীরবে চাহিয়া রহিল, মনের মধ্যে সেও বুঝি একটু অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আহা! এই কচি কিসলয় প্রাণটি সে স্বহস্তে দলিত করিবার ভার কেনই লইল? কিন্তু না, এ দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় অনুচিত। সমাজ সব চেয়ে বড়, এবং তারপরেও বন্ধুত্ব! বন্ধু হইয়া বন্ধুকে এই মোহ হইতে রক্ষা করিবে না? কত দিনের এ পরিতাপ? মনকে কঠিন করিয়া তাহাকে দৃঢ়স্বরে কহিল, "তুমি সব ঠিক ক'রে রাখগে রেবা, আমি এখনি গিয়ে তোমায় তুলে দিয়ে আস্‌ব, যাও লক্ষীটি অমন ক'রে আর কেঁদ না—" রেবা চোক মুছিবার ছলে কাপড় দিয়া মুখ ঝাঁপিয়া, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল; কিছুতেই সে নিজেকে সংবরণ করিতে পারিল না। আর যে একটি ক্ষুদ্র শেষ অনুরোধ তাহার দুর্ব্বল বুকখানার মধ্যে প্রকাশের জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছিল, তাহাও সে ফুটাইতে না পারিয়া কিছুক্ষণ পরে নতনেত্রে কোনদিকে না চাহিয়াই চলিয়া গেল। প্রমথর মনে হইল তাহারি অনুকৃতি করা প্রাণহীন একটা গড়া মূর্ত্তি যেন এই চিত্রশালা হইতে কোন যন্ত্র চালাইয়া লইয়া যাইতেছে।

৫

বিভূতি বাড়ী গিয়া দেখিল দ্বারে নহবৎ বাজিতেছে এবং দাস-দাসীরা রঙ্গিন কাপড় পরিয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া কর্ম্ম কাজ করিতেছে। বিস্মিত হইয়া সে অন্দরে প্রবেশ করিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, 'মা'! গৃহিণী তখন একটা ঘরের মধ্যে শুভচণ্ডী ও সত্যনারায়ণের পূজায় কত গণ্ডা কদলীর আবশ্যক, একজন আশ্রিতাকে তাহাই বুঝাইয়া দিতেছিলেন; এবং মটকাসাড়ীর প্রান্তটা জানুর কাছ পর্য্যন্ত গুটাইয়া ধরিয়া, অতি কষ্টে শুচিতা রক্ষা করিয়া, বাড়ীময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলকার প্রতি হুকুমজারি করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইতেছিলেন। বিস্মিত বিভূতি দেখিল কঠিন পীড়ার পরিবর্ত্তে বেশ একটি বড় রকম উৎসবের সূচনা হইয়াছে। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল,—"তবে কি—না তাহা হইলে বাজনা বাজে কেন?" ছেলের মুখের 'মা' ডাক শুনিয়া মাঙ্গল্যদায়িনী শুচিতা, কদলী সব ভুলিয়া দ্রুতপদে ছুটিয়া আসিলেন। ঐ ডাক যে তিনি কতকাল শুনিতে পান নাই এরি জন্য যে প্রাণ তাঁহার যায় যায় হইয়াছে। "বাবা আমার এলি রে?"

মাকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিয়া বিভূতির মনটা মুহূর্ত্তে বাঁকিয়া দাঁড়াইল, ঈষৎ রুক্ষস্বরে সে কহিল, "এই বুঝি তোমার অসুখ?" মাতা পুত্রের পরিশ্রমম্লান মুখখানি সযত্নে আঁচল দিয়া মুছাইয়া বলিলেন, "ও বাবা বড় অসুখ হয়েছিল রে, মরতে মরতে বেঁচেছি।"

পুত্র এ কৈফিয়তে বিশেষ খুসী হইল না, সে মুখটা সরাইয়া লইয়া

একটু উদ্ধতভাবেই আবার বলিল, "ভালতো আছ তবে অনর্থক আমায় এতদূর থেকে টেনে আনা কেন? এ সব কি?" আঙ্গুল দিয়া সে বাজনদারদের দিকে নির্দ্দেশ করিল।

গৃহিণী একটু ঢোক গিলিয়া বলিলেন, "ও একটা কাজ আছে, তা তুই নেয়েখেয়ে একটু ঠাণ্ডা হ' বল্‌বো তখন।"

বিভূতি কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বাড়ীর পুরাতন সরকার একটা ছবি আনিয়া গৃহিণীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এই ছবি কনের বাড়ী থেকে এসেছে। তা এ তো দিব্যি মেয়ে; বিভু তুমি নিজেই দেখে কেন বল না।"

বিভূতি প্রথমটা ভাল করিয়া না বুঝিয়া ফটোগ্রাফখানা হাতে করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু যেমনি ইহার মধ্যের সত্যটা তাহার নিকট একটি দিব্য ফুটফুটে বালিকার মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইয়া আসিল, অমনি আকস্মিক ক্রোধ ও বিরক্তি তাহাকে মুহূর্ত্তে উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিল। সক্রোধে ছবিখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মায়ের পানে ফিরিয়া বলিল, "এইজন্য বুঝি আমায় ছল ছুতো ক'রে এখানে আনা হ'ল? এমন যদি কর তাহ'লে আমি জন্মের মতন চ'লে যাবো জেনে রেখ, কিছুতেই আর এ-মুখো হবো না। আমি যাকে পছন্দ করেছি তাকে ছাড়া অন্য মেয়ে আমি বিয়ে কর্‌বো না, তোমরা মিথ্যে মিথ্যে এমন ক'রে আমায় জ্বালিও না বল্‌ছি!"

গৃহিণীও আর সহ্য করিতে পারিলেন না, সক্রোধে বলিলেন, "তাকে কক্ষণো তুই বিয়ে কর্‌তে পাবি না। কোথাকার ছোটলোকের মেয়ে, একটা ধিঙ্গি মারহাট্টির মেয়ে আমার শ্বশুরবংশের বউ হবে! তার এত বড় স্পর্দ্ধা!"

বিভূতি চীৎকার করিয়া বলিল, "নিশ্চয় আমি তাকে বিয়ে করবো, তোমার খুসী না হয় তুমি তাকে তোমার শ্বশুরবংশের বউ ব'লো না, তাকে ঘরে নিও না, আমি তাকে বিয়ে করবই।"

যেমনি আসিয়াছিল তেমনই [illegible] ছাড়িয়া পায়ে হাঁটিয়া ষ্টেশনের দিকে তখনি চলিয়া গেল। তাহার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া কেহ একটু বাধাও দিতে সাহস করিল না। অপমানিতা মোক্ষদায়িনী অবমানিত কর্ত্তৃত্বের এবং আহত মাতৃত্বের তীব্র আঘাতে বহুক্ষণ রোষক্ষুব্ধ দণ্ডাহত বিষধর-সর্পের মতই গর্জ্জিতে লাগিলেন, রুদ্ধরোষে জ্বলন্ত বস্ত্রখণ্ডের মত আপনার আগুনে আপনিই দগ্ধ হইতে লাগিলেন। মাতৃত্বের স্নেহগর্ব্বে এত বড় আঘাত কে কবে পাইয়াছে?

তারপর পুত্র সত্যসত্যই ফিরতি ট্রেণেরও অপেক্ষা না করিয়া একটা পেসেঞ্জারে চড়িয়া সেই দূর পথে ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া পূজার ঘরে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন। "আমি তোমার কাছে [illegible]বে কি অপরাধ করেছিলুম ঠাকুর? এমন ক'রে তুমি আমার [illegible]ক থেকে ডাকিনীকে দিয়ে যে আমার ছেলে কেড়ে নিলে? হে [illegible]নাথনাথ হরি! অনাথার ধন ফিরে দাও, আমি তোমার সোণার [illegible]দি বাঁধিয়ে দোব। আমার যে আর কেউ নেই গো, আমার যে [illegible]র কেউ নেই!"

৬

অস্তমান সূর্য্যের রাঙ্গা আলোটুকু বর্ষার বর্ষণক্লান্ত মেঘের স্তর ভেদ [illegible]য়া চারিদিকে উজ্জ্বল বর্ণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই সোণালি আলোকে [illegible]নাথ নিজেদের ক্ষুদ্র বাগানটির একটা নূতন গোলাপগাছের চারার [illegible]

নুতন মুকুল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। কয়দিন ধরিয়াই সে সর্ব্বদা সশঙ্কিত হইয়া আছে,—দেশের খবর পায়ও না, লইতেও সাহস করে না, কি জানি যদিই তাহার চোখ পড়ে!

এমন সময় পশ্চাতে দ্রুত পদশব্দ শোনা গেল, মুখ ফিরাইতে না ফিরাইতে ঝড়ের মত বেগে বিভূতি আসিয়া উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "রেবা কোথায়?"

আকস্মিক বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া প্রমথ উত্তর করিল, "আমি কি জানি?"

"বাঃ তুমি জানো না তো কে জানে? শীঘ্র বল তাকে কি করেছ?"

"আমি আবার তাকে কি কর্‌বো?"

"বল্‌বে না?" "আমি জানি না।"

বিভূতি সবলে প্রমথর হাত চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "শীঘ্র বল না হ'লে আমি আত্মঘাতী হব।"

ভীত হইয়া প্রমথ উত্তর করিল, "ছাড়, ছাড়, হাতে লাগে,—শোন বল্‌চি, সত্যই আমি জানি না, তাকে যেখানে পাঠিয়েছিলুম সেখানে সে যায় নি। খবর পেয়েছি, গাড়িতে একজন সন্ন্যাসী ছিলেন বোধ হয় তাঁরই সঙ্গে অন্য ষ্টেশনে নেমে গেছে। আমিও তার জন্য উদ্বিগ্ন।" বিভূতি মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "কেন তুমি তাকে পাঠিয়েছিলে?"

প্রমথ ধীরে ধীরে কহিল, "তোমাকে রক্ষা কর্ব্বার জন্য।"

"আমার সর্ব্বনাশ কর্ব্বার জন্য বল, তুমি আমার বন্ধু না?"

"হ্যাঁ, তাই তোমার বন্ধুরই কাজ করেছি। স্থির হও,—ওঠো, শোন।"

বিভূতি উঠিয়া বলিল, "তুমি না বল আমি পৃথিবী খুঁজে তাকে বা'র কর্‌বো।"

সে যাইতে উদ্যত হইল, প্রমথ বাধা দিয়া এবার তাহার হাত ধরিল। "কি কর্‌চ, তুমি কি পাগল হয়েছ?"

"হাঁ হয়েছি, কিন্তু আমায় তোমরাই পাগল কর্‌লে, উপকার যদি বল ঐটুকুই যা করেছ।"

"বিভু! বিভু! ভেবে দেখ সমাজ, সংসার—"

বিভূতি হাত ছিনাইয়া লইল। "গোল্লায় যাক্ সমাজ সংসার! সমাজ সংসার আমার কে?" অগ্রসর হইয়া প্রমথ বলিল, "কিন্তু পিতৃপুরুষ, মা?"

বিকট-চক্ষে চাহিয়া সে উত্তর করিল, "আমার কেউ নয়, আমি কারু নই।"

তারপর উন্মাদ কঠোর হাসি হাসিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

৭

কলিকাতা বিডন উদ্যানে সেদিন ভারি ভিড়। পাশাপাশি দুইটা বেদি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। বেদান্ত-প্রচারক আনন্দস্বামী, তিব্বত, চীন জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণান্তে ফিরিতেছেন। পথে সমস্ত সহরে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা হইতেছে এবং শিক্ষিত অশিক্ষিত জনমণ্ডলী ঝুঁকিয়া পড়িয়া মহাআগ্রহে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতেছে। আজ তিনি কলিকাতায় পৌছিয়াছেন তাই তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য নগরবাসিগণ উৎসুক হইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে। একখানা গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া, ফুল দিয়া সাজাইয়া তাঁহার ভক্তেরা তাঁহার জন্য

ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিল, সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "অনাবশ্যক ভারবহনে তোমরা এতই ব্যগ্র কেন? শক্তি সঞ্চয় ও পরিপোষণ কর অস্থানে শক্তির অপচয় করিও না।" সহস্র নগ্নপদ ভক্তের মাঝখান দিয়া গৈরিকধারী বিদেশী শিষ্য শিষ্যাদের সহিত সৌম্যমূর্ত্তি মহাপুরুষ পদব্রজে টালার বাগানবাড়ীতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে যে গৈরিকবসনা ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ নারী প্রসন্নমুখে সর্ব্বাগ্রে গমন করিতে ছিলেন সকলেই ভক্তিসম্ভ্রমে নত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলাবলি করিল, "ইনিই সেই বিখ্যাতা বিদুষী কুমারী ত্রিগুণাতীতা।"

৮

রেভারেণ্ড ইমানুয়েল মুখার্জ্জী প্রোটেষ্টাণ্ট খৃশ্চান পাদরী। যেখানে যত হিন্দুধর্ম্মের বিষয়ে বক্তৃতা বা আলোচনা হয়, ঠিক তাহার পরেই অত্যন্ত তীব্রভাষায় তাহাদের প্রতিবাদ করাই যেন তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত। মাসিকপত্রের প্রবন্ধগুলার উপর কখনো নিজের সম্পাদিত 'পরিত্রাতা' কাগজে বা মিশনারীদের অধীনস্থ অন্যান্য কাগজগুলায় কখন বা বক্তৃতা দ্বারা তীব্রতাপযুক্ত ভাষায় আক্রমণ করিতে একবারও তাঁহার ভুল হয় না। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি হিন্দুর পূজনীয় মহাত্মাদিগের সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য অতিশয় কঠোর। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণই বিশেষ করিয়া তাঁহার অশ্রদ্ধার পাত্র। একদিন একটা প্রবন্ধের একস্থলে তিনি লিখিয়াছিলেন "এমন 'সেল্‌ফিশ্ গডের' কথা কেহ কখন শুনিয়াছ? হিন্দুদের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ গীতায় তাহাদের ভগবান্ বলিতেছেন, 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ!' 'অহং'এর

পরিপূর্ণ চিত্ত এই দাম্ভিকই উহাদের পূজা দেবতা! হিন্দুর পূর্ণাবতার!" ইহার প্রতিবাদের তরফ হইতে বাইবেলের যে সকল বচন তুলিয়া দেখান হইয়াছিল, তাহাতে দুই দলে অনেক দিন পর্য্যন্ত লেখালেখি চলিয়া পাঠকগণকে একটু নূতনত্ব দান করিয়াছিল। মুখামুখি বিবাদের অপেক্ষা এই লেখার কোন্দল দর্শক অর্থাৎ পাঠকদলের অধিকতর মুখরোচক হইয়া থাকে।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গির্জ্জায় তাঁহার চারিপাশে যে সমুদয় ভক্ত সমাগত হইত, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অতি নিম্ন শ্রেণীর লোক। তাঁহার বক্তৃতায় কিনা জানি না হয়ত তাহা অপেক্ষা কোন বিশেষ প্রলোভনে পড়িয়াই গোটা কতক গ্রামের তাঁহারই কতকগুলি প্রজা তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের জন্য ফ্রি স্কুল এবং দাতব্য চিকিৎসালয়েরও তিনি বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানে কোন একটি অন্ধ খঞ্জ হিন্দু ভিখারীর অথবা পাঠার্থী দরিদ্র হিন্দু বালকের স্থান হইত না। এই গোঁড়া খৃশ্চান পাদরীটি এই অস্বাভাবিক হিন্দুদ্বেষের জন্য সর্ব্বত্রই বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। লোকে ইঁহাকে 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' আখ্যা দিয়াছিল। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা পদটাকে আর একটু নামাইয়া নারীপদাহত কোন কাষ্ঠময় পদার্থের সহিত উপমেয় করিয়া বলিত 'ঘরের ঢেঁকী কুমীর'! ইংরাজ মিশনারীরা তাঁহাকে বাহিরে অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া মনে মনে তীব্র ঘৃণার হাসি হাসিত। কিন্তু রেভারেণ্ড মহাশয়ের কাহারও স্তুতি নিন্দায় দৃক্‌পাত ছিল না। তিনি নিন্দা স্তুতিতে তুল্য মৌনী থাকিয়াই অটল ভাবে নিজের কর্ম্ম করিয়া যাইতেন। প্রতিমা-পূজক বা ব্রহ্ম-উপাসক সমস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ই তাঁহার তীব্র ঘৃণার পাত্র ছিল।

কিন্তু ধর্ম্মের চেয়েও সামাজিক আচার ব্যবহারের উপরই তাঁহার অক্রোশটা যেন একটু অধিকতর। ভারতবর্ষীয় হিন্দুজাতি যে আর্য্যজাতি-সম্ভূতই নয়, তাহারা কোল সাঁওতালের গোষ্ঠি এবং তাহাদের শাস্ত্র ও আচার যে অনার্য্য অসভ্যদের শাস্ত্র ও আচার—এসকল প্রমাণ ইউরোপীয় সর্ব্বজ্ঞদের এবং তাঁহাদের প্রসাদজীবী দলের কল্যাণে তাঁহার যথেষ্টই জানা ছিল এবং সে জ্ঞান তিনি অন্যকেও প্রদান চেষ্টায় বিশেষরূপই অধীর ছিলেন।

সেদিন দেশী বিদেশী সংবাদপত্র যখন বেদান্তপ্রচারক আনন্দ-স্বামীর প্রত্যাগমন ও তাঁহার সফলতার সংবাদে কলেবর পূর্ণ করিয়া বিজয়দুন্দুভিনাদ ঘোষণা করিল, রেভারেণ্ড মুখার্জ্জী তখনই তাঁহার উপর জাতক্রোধ হইয়া তাঁহার বক্তৃতার যে সকল অংশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাদের উপর যৎপরোনাস্তি কঠোর ভাষায় কঠিন মন্তব্য প্রকাশ করিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেন যে, এই ধর্ম্ম ও ইহার প্রচারক উভয়ই ঝুঁটা! পরসপ্তাহের কাগজে তাঁহার সমালোচনার একটা আলোচনা বাহির হইল; বিরক্তিকুঞ্চিত ললাটে পাদরী দেখিলেন প্রবন্ধটার নীচে নাম স্বাক্ষরিত রহিয়াছে "ত্রিগুণাতীতা!"

এমন ভাষার লালিত্য, এমন রচনার মাধুর্য্য আর কখনও তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইয়াছে বলিয়া স্মরণ হইল না। পক্ষপাতশূন্য মার্জ্জিতভাষায় লেখিকা তাঁহার বিদ্বেষ-বিষ-দিগ্ধ আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রবল খণ্ডনযুক্তি সকল প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন মাত্র, কোথাও ফিরিয়া আক্রমণ করেন নাই। এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন, "আমরা আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত বিষয়কে জানিতে পারি না, কেন না আমার পরিচ্ছিন্ন

জ্ঞান পরিচ্ছিন্ন বস্তুতত্ত্বকেই ধারণা করিতে পারে, তাহা অপরিচ্ছিন্ন পদার্থকে জ্ঞেয় করিতে অক্ষম, এবং আমি যাহা বুঝি নাই তাহার অস্তিত্ব স্বীকারে আমার অনাদি-অবিদ্যারূপী অহংই আমায় বাধা প্রদান করিয়া থাকে। শিশুর দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ভূমিরাকাশেই ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা স্থির রাখে; কিন্তু বয়োবৃদ্ধি হইলে যখন তাহার কূপমণ্ডূকতা ঘুচিতে থাকে, জ্ঞানেরও সেই সঙ্গে তেমনি প্রসার হয়। এমনি করিয়া যখন পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন ও বৃহত্তম হইয়া যায়, তখনি তাহা পরাকাষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু ইহা বহু সাধনাসাপেক্ষ। সেইজন্য ইহার পূর্ব্বে তাহার জন্য একটা অবলম্বন বা জ্ঞানপ্রসারের মার্গও তো প্রয়োজনীয়। বালিকা মাটির ঢেলাটিকে সন্তানস্নেহে বক্ষে ধরিয়া চুম্বন করে। সে তাহার বাহ্যচেতনবিরহিত প্রতিমায় একটা গোপন মানবত্ব অনুভব না করিলে, এ স্নেহাস্বাদ কোন মতেই পাইত না। কিন্তু তৎকর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ অনুরুদ্ধ হইলেও সেই শিশুর জননী তাহার মৃৎপাঞ্চালিকাকে সেই স্নেহ দান করিতে সক্ষম হইবেন কি? না, তাঁহার উচ্চজ্ঞান তখন আর সেই মানব-হস্তগঠিত সন্তানকে স্বীকার করিতে চাহিবে না, তথাপি শিশুর বিশ্বস্ত আনন্দে আঘাত করিতেও তাঁহার মাতৃকর্ত্তব্য যে আহত হয়; সেই জন্য তিনি হাসিয়া বলিবেন, 'বাছা তোমার ছেলেকে তুমি আদর কর আমারটিকে আমি আদর করি।' কিন্তু তথাপি তাহার এই অল্পজ্ঞতার জন্য তাহাকে তিরস্কার করিবেন না। তিনি জানেন ইহা সত্য বস্তু নয় বটে কিন্তু ইহা সত্য বস্তু লাভেরই প্রথম সোপান। সত্যের একান্ত বা অত্যন্ত বিরোধী নয়। তাহার ভবিষ্য মাতৃত্বেরই অঙ্কুর। যে শিশু, যে অজ্ঞ, যে সর্ব্বব্যাপককে নিজের ক্ষুদ্র চিত্তে ধারণা করিতে সক্ষম নহে, সে যদি সর্ব্বাত্মাকে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রে;—তৃণে,

স্তম্ভে, বৃক্ষে, শিলায় অর্চ্চনা করে, তাহাতে এমন ক্ষতিই বা কি ?......
......মানব! ভ্রান্ত হইও না! বাহিরের রৌদ্র ঝলসিত আকাশ হইতে শান্ত অন্তরাকাশে দৃষ্টি ফিরাও, দেখিবে সেখানে যথার্থতঃ কোন ভেদ নাই। তোমার সঙ্গে আমার পৃথক্ সত্তাও নাই,—আছেন কেবল অখণ্ডৈকরস, সত্যজ্ঞানানন্দময় পরাত্মা। তিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত। যখন জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে তখন সকল ভ্রান্তি ঘুচিয়া এই এক মহাবাণী অন্তরাকাশে চিরধ্বনিত শুনিবে—"ব্রহ্মাহং, শিবোহহং, সোহহম্!"

এই প্রবন্ধপাঠে খৃষ্টান প্রচারকের বিদ্বেষবহ্নিতে ইন্ধন পড়িল মাত্র, দহন কমিল না। ঘৃণার হাসি হাসিয়া কহিলেন, "হিদেন স্ত্রীলোকটার স্পর্দ্ধা তো বড় কম নয়? এ অমার্জ্জনীয়!"

আবার 'পরিত্রাতা'য় নূতন তেজে প্রবন্ধ বাহির হইল।

পাঠ করিয়া বৃদ্ধ পুরোহিত পিটার্স কহিলেন, "এটা কলহের মত শুনাবে না?" ধর্ম্মভীরু বৃদ্ধের ব্যক্তিগত কোন বিদ্বেষ ছিল না। রেভারেণ্ড মুখার্জ্জী সদম্ভে কহিলেন, "হয় হউক, উহার বড় অহঙ্কার দেখ্‌ছি। এ আমার সহ্য হয় না।" এবারেও "ত্রিগুণাতীতা' ইহার প্রতিবাদ করিলেন। আবার প্রতি সংবাদপত্র তাহার প্রশংসায় ভরিয়া গিয়া রেভারেণ্ড মুখার্জ্জীর আক্রোশ বাড়াইয়াই দিল।

ত্রিগুণাতীতা একস্থলে লিখিলেন, "যাহা জানিলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর কিছু অজ্ঞাত থাকে না, তাহা না জানিয়া সেই মহাতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া ধৃষ্টতামাত্র। অজ্ঞের প্রতি করুণাই স্বাভাবিক, তাহার সহিত তর্ক সম্ভব নয়। যদি কেহ বলে, 'আমি তাহা জানি' তবে তাহা তাহার ভ্রান্তি! উপনিষদ্ বলিয়াছেন "যদি

মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূন ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্" 'যে তাঁহাকে জানিয়াছে বলে সে তাঁহাকে অল্পই জানে।' যে যথার্থই জানিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে উপনিষদ বাক্য এইরূপ "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।' যাহার সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি হইয়াছে তাহার চিত্তে ঈর্ষা দ্বেষের স্থান কোথায়?"

প্রবন্ধযুদ্ধ চলিতে লাগিল। একটা সমালোচনার প্রতিবাদে ত্রিগুণাতীতা লিখিয়াছিলেন, "'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' এস্থলে শ্রীভগবান্ কোন জাগতিক ধর্ম্মমতকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলেন নাই, তাহা সার্বভৌমিক সত্য-ধর্ম্ম অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব। 'মাং একং' শব্দ এখানে আত্মার স্বরূপে (অর্থাৎ সমষ্টিরূপে পরমাত্মায়) প্রযোজ্য। সর্ব্বপ্রকার ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করত একমাত্র যে আত্মসত্তা অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তা তাহাতেই নিমগ্ন হও, একমাত্র ইহাতেই সর্ব্বকলুষবিমুক্ত হইতে পারিবে। কারণ জন্ম মৃত্যুর নিবৃত্তি জীবের চরম উন্নতি, আর তাহা এই আত্মজ্ঞান দ্বারাই লভ্য অন্য কিছুতেই নয়।" ইত্যাদি।

পিটার্স বলিলেন, "আমাদের লর্ড তাঁহার পুত্রের দ্বারা বলাইয়াছিলেন, "If you forsaketh others and taketh me I ..."।

অধীর হইয়া রেভারেণ্ড মুখার্জ্জী বাধা দিলেন, "থাম থাম পিটার্স এই স্ত্রীলোকটা আমাকে অস্থির করেছে, ওকে পরাজয় করতেই হবে। ওদের ভিত্তিহীন ধর্ম্ম বলে, 'এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা মূলতঃ অযথার্থ; সমস্তই স্বপ্ন! কিছুই হয় নাই, কিছুই হইতেছে না, কিছুই হইবে না, কেবল মাত্র মায়ার বিজৃম্ভণে ইন্দ্রজালের মত অলীকের স্ফূর্ত্তি হচ্ছে।

জ্ঞানের উদয়ে অবিদ্যাধ্বান্ত অন্তর্হিত হ'লেই মায়াউপরত জীব নিজের স্বরূপে মিলিত হ'য়ে শান্ত হবে। আবার তর্ক করে "ভগবদ্ বাক্য"! যদি মায়ারই খেলা তবে "ভগবদ্ বাক্যও" তো সেই মায়াই? 'এক পরমাত্মা মাত্র সর্ব্বভূতে অবস্থিত প্রত্যগাত্মারূপে প্রতীয়মান হচ্ছেন, বস্তুতঃ জীব ঈশ্বর দ্বিত্ব মানব কল্পনা মাত্র!' কি স্পর্দ্ধা! ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র মানব সে বিশ্ব জগতের রাজাধিরাজের সহিত এক হ'তে চায়! বামন হয়ে চন্দ্রে হস্ত প্রদানের সাধ করে—আশ্চর্য্য ধর্ম্ম! আমার ইচ্ছা করে, এক দিন গুরু শিষ্যা দু'জনকেই আমি ঘোরতর তর্ক বিচারে আহ্বান করি, দেখি তাদের কত দর্প!"

৯

তখন বর্ষা ঋতু না হইলেও অকাল বর্ষণে সহসা সেদিন অসময়ে সভাভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। অসমাপ্ত বক্তব্য পরদিন শেষ করিবার অনুরোধ গ্রহণ করিয়া বেদান্তশাস্ত্রপ্রচারক স্নিগ্ধ হাস্যের সহিত নিজের সম্মতি জানাইয়া চলিয়া গেলেন; তাঁহার ভক্তগণ, শিষ্যগণও তাঁহার অনুসরণ করিল। ভগ্নোৎসাহ খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক শূন্যনেত্রে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার পার্শ্বচারিণী ভস্মাচ্ছাদিত-হোমানলের মত দীপ্তমূর্ত্তি সন্ন্যাসিনীর দিকে তাঁহার অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল ইনিই যে তাঁহার মসীযুদ্ধের অচেনা প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রহ্মবাদিনী কুমারী ত্রিগুণাতীতা তাহাতে সন্দেহলেশও ছিল না। ঈর্ষায় কি উত্তেজনায় আনন্দে কি বিষাদে, কে জানে কি একটা ভাবে তাঁহার অজের চিত্ত সহসা বালকের ন্যায় একান্ত বিকল হইয়া উঠিতে লাগিল মঞ্চ হইতে নামিয়া দ্রুতপদে কাছে গিয়া তাহাকে ফিরাইতে ইচ্ছা হইতে

লাগিল। ফিরাইয়া কি বলিবে? বলিবে 'গর্ব্বিতা রমণি! যে হিন্দু সমাজ আমার চির জীবনের শান্তি হরণ করিয়াছে, জন্মান্তরের আশা ভরসা পর্যান্ত আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছে, তুমি তাহারি হইয়া আমার সহিত বিবাদ করিতে চাও? এ অপরাধে অন্যকে বরং ক্ষমা করিলে করা যায়, তোমাকে কিন্তু আমি কোনমতেই ক্ষমা করিব না। কেন তাহা আমি নিজেই জানি না; কিন্তু আমার হৃদয় মন সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার পরাজয় কামনা করিতেছে।"

কিন্তু তিনি কিছুই করিলেন না। মেঘাচ্ছন্ন প্রকৃতির ম্লানতার গর্ভে সচল মেঘে আবরিত চন্দ্রের ন্যায় তপস্বিনী সঙ্গীদের সহিত অদৃশ্য হইয়া গেলেন। তাঁহারা দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলে ইমানুয়েল সহসা যেন জাগিয়া উঠিয়া সঙ্গীর পানে ফিরিয়া সদম্ভে কহিলেন, "বেচারা আজ তার দেবতার কল্যাণেই শুধু বাঁচিয়া গেল!" পিটার্সের মনের মধ্যে হাসি না পাইলেও মন রাখা হাসি হাসিয়া উপরওয়ালার মান সে ঠিক বজায় রাখিল।

পরদিন আবার বিডন উদ্যানে ভিড় আরম্ভ হইল। সে দিন আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। পূর্ব্ব দিনের বৃষ্টিতে গাছ পালার উপর বেশ একটি শ্যামল চিক্কণতা প্রকাশ পাইতেছিল, দিবসের শেষ আলোটুকু অতি রমণীয় ভাবে একটি শুভ্র মেঘজালের মধ্য দিয়া রক্ত আভায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। উৎসুক জনমণ্ডলী চারিদিকে চাহিতেছিল, বিখ্যাত বাগ্মী বা প্রসিদ্ধ বিদুষীর তখনও আগমনচিহ্ন দেখা যায় নাই।

কলিকাতার উপকণ্ঠাবস্থিত গ্রাম হইতে ইমানুয়েলের অনেকগুলি দেশীয় খৃষ্টান শিষ্য আজিকার সমরাঙ্গণে দর্শকরূপে আগমন করিয়াছিল।

সকলের মুখেই একটু অবজ্ঞাপূর্ণ রকমের হাসি। রেভারেণ্ড মুখাৰ্জ্জী কহিলেন, "কি হে পিটার্স! 'হিদেন' স্ত্রীলোকটা ও তার গুরুটা বেগতিক বুঝে সরে পড়্‌ল নাকি?"

পিটার্স হস্তদ্বারা বক্ষস্থলে ক্রশ চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া ভাবযুক্ত মুদিত নেত্রে কহিলেন, "প্রভু বলিয়াছেন তাঁর নামের আলোকে অজ্ঞান তমসা দূরে পলায়ন কর্‌বে।"

কিন্তু জয়ী হইয়াও ইমানুয়েলের মনে জয়ের আনন্দ তেমন স্থায়ী হইল না। কই সেই অহঙ্কৃতা নারী তো তাঁহার নিকট তর্কে নতমুখ হইল না? সে তো এখনও বলে নাই যে,—'তোমার ধারণাই ঠিক। হিন্দু বলিয়া জগতে একটা জাতি, একটা কোন কিছু নাই। তাহাদের ধৰ্ম্ম হইতে কৰ্ম্ম অবধি সব মিথ্যা—সমস্তই জুয়াচুরি। তাহারা জাহান্নমে যাক,—তাহাদের নাম এ পৃথিবী হইতে যত শীঘ্র হয় বিলোপ হোক।'

এমন সময় দূরে বৃক্ষান্তরাল পথে সচল রক্তমেঘখণ্ডসদৃশ সন্ন্যাসীদের গৈরিক দেখা গেল। উৎকণ্ঠিত জনসমূহের মধ্যে একটা কোলাহলের সহিত অনেকখানি আনন্দও জাগিয়া উঠিল।

ঠিক এই সময়ে একটা যেন পরিচিত স্বরে ইমানুয়েল চমকিয়া উঠিল, শুনিল অদূরে কে কাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, "হ্যাঁ এখন নিরাত্মীয়ই বইকি। আর সেটা অভাগা আত্মীয়দেরই সৌভাগ্য বল্‌তে হবে। ওর মা মাগী কি কম জ্বালায় জ্ব'লে পুড়ে হা ছেলে যো ছেলে ক'রে মরেছে। সে সব কথা মনে হ'লে এখনও বুক যেন ফেটে যায়। বড় হৃদয়হীন পাষণ্ড, ও।"

"আসল নামটা কি ছিল মশায়?"

"আর সে নাম কেন অমৃত বাবু? আজ চৌদ্দ বৎসর আমাদের সে বিভূতিভূষণ ম'রে গেছে ওটা তার প্রেতাত্মা, সে বিভূতি কি ওই!" উত্তরদাতা গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

এতদিন পরেও তাহার প্রমথর চিনিতে বাধিল না। মুহূর্ত্তের জন্য বুকের মধ্য দিয়া একটা অগ্নিময় তরঙ্গ প্লাবিত হইয়া গেল। দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে আত্মদমন করিয়া সে ঘৃণার হাসিতে সমস্ত গ্লানি ধুইয়া ফেলিয়া সম্মুখে চাহিতে হঠাৎ নিজের দৃষ্টিতে অবিশ্বস্ত হইয়া উঠিল। সে দেখিল চীরধারী সন্ন্যাসীর পরিবর্ত্তে তাঁহারি পাদপীঠে উন্নমিতাননা মুক্তকুন্তলা সন্ন্যাসিনী সহাস্য মুখে দাঁড়াইয়া! আজ তিনি ভস্মচিহ্নবিরহিতা মেঘমুক্ত শরচ্চন্দ্রের ন্যায় শোভমানা। সে মূর্ত্তি হইতে তাই যেন আরও তেজ, আরও জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতেছিল। পদচুম্বিত গৈরিক বসনের উপর অনাবৃত মৃণাল ভুজদ্বয় নমিত হইয়া পরস্পর মিলিয়া রহিয়াছে; শান্ত অথচ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত সন্ধ্যাতারার মত দুইটি সমুজ্জ্বল নেত্রতারকা ভক্তিনত জনমণ্ডলীর উপর সংস্থাপিত। সে মূর্ত্তির পানে চাহিয়াই খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক বারে বারে শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। এই মহিমময়ী দেবী ইঁর প্রত্যেক অঙ্গুলীর গঠন কি তাঁহার অনন্ত সুপরিচিত নয়?

তখন চারিদিকে "মাতাজীর জয়" ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বী *মন্ত্রমুগ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় তাহার আবদ্ধ দৃষ্টি ফিরাইতে না পারিয়া অনিমেষে তাহারই পানে; তাহার সেই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরই পানে চাহিয়া* ছিল।

ত্রিগুণাতীতা তখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার গুরুর আকস্মিক অসুস্থতাই তাঁহাকে এইরূপ অযোগ্যতর হস্তে উচ্চাধিকার

গ্রহণে বাধা করিয়াছে—নম্রসঙ্কোচে ইহা প্রকাশ করিয়া ভক্তিকৌতূহল মিশ্রিতচিত্ত সন্তানগণের সাগ্রহ নিবেদনে পূর্ব্বদিনের অসমাপ্ত আলোচ্য বিষয় তথা, হইতে পুনরারম্ভ করিলেন। তাঁহার বলিবার ভঙ্গি, বুঝাইবার ক্ষমতা, শাস্ত্রার্থ-বিচার-শক্তি ও শাস্ত্রজ্ঞান শিক্ষকেরই প্রতিরূপ। কেহ বুঝিতেও পারিতেছিল না যে, তাহারা পুরাতন কালের কোন উগ্রতপা ঋষির উপদেশ প্রাপ্ত না হইয়া একজন সুকুমারী নারীর বাণী শ্রবণ করিতেছে। পিটার্স সঙ্গীর কাণের কাছে নত হইয়া কহিল, "কি দুর্দ্দৈব! দেশের লোকগুলা এরই এত প্রশংসা করে! এ তো মুখস্থ করা শ্লোক আওড়াচ্ছে, যেন কোন শিক্ষিতা নটী অভিনয় কর্‌ছে।"

রেভারেণ্ড মুখার্জ্জী কিন্তু এমন সুযোগ সত্ত্বেও একটি কথা কহিলেন না। তাঁহার চক্ষু সে সময় পলকহীন হইয়া গিয়াছিল। শরীরে স্পন্দন ছিল কি না তাহাও ঠিক করিয়া বলা যায় না। এই মূর্ত্তি কি বলিতেছিল, অথবা কিছুই বলিতেছিল কি না তাহা তাঁহার কর্ণে বা মস্তিষ্কে পৌঁছিতেও ছিল না। শুধু কি যেন একটা স্মৃতির তরঙ্গ মনের মধ্যে উত্তাল হইয়া উঠিতেছিল। শুভ্রশরতের এক অম্লান প্রভাতে ঘনতালী-কুঞ্জতলে এক ক্ষুদ্রকায়া চপলা বালিকার সীমাবদ্ধ সৌন্দর্য্য,—না এ অতনু সৌন্দর্য্য তো সে নয়;—তথাপি বুঝি সে এই! এ' কি! এ' কে? কোথা হইতে সহসা সকল ঘুমন্ত নিবন্ত বৃত্তিগুলা জাগাইয়া তুলিয়া এ মায়াবিনী অকস্মাৎ কোন্ অতল হইতে তলাইয়া, কোন্ স্বপ্নলোক হইতে জাগিয়া উঠিল? এই সমুন্নতদেহ, জ্ঞানজ্যোতিঃ বিস্ফারিত ওই দুটি নেত্র যাহার তুলনা ত্রিজগতে কোথাও খুঁজিয়া মিলে

না,—মহিমার গৌরবে উন্নত, আবার করুণার ভারে নম্র, এমন দৃষ্টি তো কই স্মৃতিসাগরের তলে কোথাও জাগিয়া নাই! তথাপি যেন কি আছে,—কোথায় যেন আছে! একি তাহার চির পরিচিতা? না তাহা নয়। তবে তাহার অপরিচিত কি এ মূর্ত্তি? না ঠিক তাহাও নয়। তবে কে এ নারী? এ' কে? কে? কে?

পুরাতন চিত্রকর বজ্রবাণবিদ্ধের ন্যায় নিস্পন্দে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার তপস্যা আজ তপস্যার্জ্জিতা দেবীর আসনে দাঁড়াইয়া, আর সে কোথায়!

দর্শকগণ তখন নবীন তপস্বিনীর শক্তিমন্ত্রে মন্ত্রসম্মোহিত, কেহ তাঁহার মুহ্যমান অবস্থা লক্ষ্য পর্য্যন্ত করিল না। বহুক্ষণ পরে সসংজ্ঞ হইয়া খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক যখন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর পানে ফিরিলেন, তখন তাঁহার বক্তব্য সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে, তিনি তখন করুণাপূর্ণ নেত্রে ললিতগ্রীবা ঈষৎ ফিরাইয়া দেবী-প্রতিমারই মত অবিচল দাঁড়াইয়া প্রতিপক্ষের শরক্ষেপণ প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার মুখের উপর একটী বিমল ঔদার্য্য ভিন্ন কোন প্রকার ভাবোত্তেজনা মাত্রও ছিল না। বুঝি জগতের আদিসৃষ্টিতে সর্ব্বপ্রথম বিশ্বতন্ত্রীতে জাগরণের সুর চড়াইয়া বেদমাতা বাণী এমনি করুণাপূর্ণ চিত্তেই ঘুমন্ত জগতের নিদ্রাভঙ্গ প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন।

সংজ্ঞাপ্রাপ্ত পাদরীর কর্ণে কেবলমাত্র তাঁহার মুখের একটী কথা ধ্বনিত হইতেছিল—"আমরা যাহা পাইবার যোগ্য নই তাহাই পাইতে চাহি,—কিন্তু যদি বিচার করিয়া দেখি, তবে অনায়াসেই বুঝিতে পারিব যাহা আমার পাওয়া দরকার ছিল ঠিক সেইটুকুই

আমি পাইয়াছি। তার চেয়ে কমও নয়, বেশীও নয়। ঈশ্বর—এবং এমন কি ধর্ম্ম, সমাজ কেহই আমাদের যোগ্যতানুসারে যাহা আমাদের পাওনা তাহা হইতে আমাদিগকে বঞ্চনা করিতে পারেন না।”

পিটার্স সঙ্গীর পিট চাপড়াইয়া সোৎসাহে কহিল, “আর কেন বন্ধু তোমার শত্রুর গর্ব্ব এইবার চূর্ণ ক'রে দাও।”

রেভারেণ্ড মুখার্জ্জী সচমকে আবার একবার সেই সানন্দ, প্রশান্ত, অপরাজিত মুখের পানে পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল। সত্য! সে কাহাকে কোথায় টানিতে চাহিয়াছিল? জগতের হৃদয়তন্ত্রীর মাঝখানে যাহার মহৎ জীবনের সুর মহান্ ছন্দে বাজিয়া উঠিয়া ভারতপারবর্ত্তী মহাদেশ সমূহকেও আজ প্লাবিত করিতেছে, যে আজ পাপপঙ্কিল অতল গহ্বরে মগ্নপ্রায় তাহাকে আবার তাহার অম্লান প্রভাতের আনন্দস্মৃতি জাগাইয়া দিয়া হাতে ধরিয়া কূলে উঠাইতে আসিয়াছে—সে তাহারই প্রতি করুণায়, তাহাকেই নিজের মোহের মধ্যে টানিয়া আনিতে না পাইয়া নিজের এই ব্যর্থ জীবন কর্দ্দমাক্ত করিয়া মাটি হইয়াছে!—আর সে? তাহার উন্মত্ত আবেগের হস্ত হইতে দূরে চলিয়া গিয়া আজ মানবত্বের সর্ব্বোচ্চ শিখরে যশের অক্ষয় মুকুট শিরে ধারণ করিয়া করুণাপূর্ণ চক্ষে তাহারি দিকে চাহিয়া জগতের বক্ষে আলোকদায়িনী দীপ্তিমতী সন্ধ্যা তারার ন্যায় তাহার সম্মুখেই ঐ দণ্ডায়মানা! এ কি অপূর্ব্ব রহস্য!

সে [illegible] দৃষ্টিতে একবার প্রতিদ্বন্দ্বীর অপরিবর্ত্তিত মুখের দিকে চাহিয়াই নীরবে আপনার পরাজয় মানিয়া লইল। তারপর নিজের

শ্রদ্ধানত ললাটে ভক্তিবদ্ধাঞ্জলি স্পর্শ করাইয়া বিস্মিত জনমণ্ডলীর মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে মঞ্চ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক দ্রুতপদে কোথায় চলিয়া গেল, একবার আর পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিলও না। বিজয়িনী তখন তাঁহার সুবিমল করুণানির্ঝরের ন্যায় স্নিগ্ধ দুইটি নেত্রতারকা তাহার পানে ফিরাইয়া প্রসন্ন মধুর হাসিটুকুর সহিত কহিলেন—

"জয়োস্তু!"

বিস্মৃত-স্মৃতি।

১

সেদিন ভোরের বেলা একটি স্নিগ্ধ মধুর সুবাস ও একটি সুকোমল স্পর্শে ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়া সহসা কে জানে কেমন করিয়া মনের মধ্যে যেন একটা বিপ্লব ঘটাইয়া দিল। শরতের এই আধ ফোটো ফোটো আলোক আঁধারের মিশ্রণে, আধ স্বপ্নে, আধ জাগ্রতে এই সুখদা সপ্তমী ঊষায় আজ আবার বহু দিবসের একটা বিস্মৃত-স্মৃতি প্রাণের মধ্যে সহসা জাগাইয়া তুলিল। তন্দ্রা-জড়িত নেত্রে আমি কখন কেমন করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, "মন্দা, তুমি কখন এলে?"

আমাকে যে স্পর্শ করিয়াছিল সে কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া বলিল—

"মণ্ডা! মণ্ডা কি দাদাবাবু! ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তুমি বুঝি পূজো-বাড়ীর মণ্ডা মিঠাইএর স্বপ্ন দেখ্‌ছো? হ্যাঁ দাদাবাবু, মণ্ডা বুঝি কারু কাছে আপনি আসে?"

স্বপ্ন টুটিয়া গেল, চমকিয়া চোখ মেলিলাম। কই? কে কোথায়? শুনিতে পাইলাম দূরে পূজাবাড়ীতে সপ্তমীপ্রভাতে কলাবউ স্নান করানর বাজনা বাজিয়া বাজিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন গ্রামকে জাগরিত ও মুখরিত করিতেছে। তখন সবে ভোর হইয়াছে মাত্র। খোলা জানালার মধ্য হইতে শিশিরসিক্ত শিউলি ফুলের ভুরভুরে গন্ধ মাখিয়া অল্প অল্প বাতাস আসিতেছিল। পূর্ব্ব গগনের নীলিমার উপর দিয়া ঊষার কনক কিরণচ্ছটা জগতে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। সদ্যোজাগ্রত পাখীর

দল তখনও প্রভাতবন্দনা শেষ করে নাই। আর আমার প্রিয়তমা নাতিনী হাসিয়া হাসিয়া আমাকে বিদ্রূপ করিতেছিল। আমি ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া আকস্মিক আবেগ সংবরণ করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—

"তুই আজ এত সকালে উঠেছিস্ যে?"

শৈল বলিল,—"আজ যে দুর্গা পূজো, আমি বাবুদের বাড়ী ঠাকুর দেখ্‌তে যাচ্চি; তুমি যাবে না দাদাবাবু?"

আমি উঠিয়া বসিয়া বলিলাম,—"তুই যা দিদি, আমি যে বুড় মানুষ এত সকালে আমি কি যেতে পারি, একটু বেলায় তোমার কাকা আমায় মাকে দর্শন করিয়ে আন্‌বে তখন।"

শৈল তখন ভারি ব্যস্ত, সে আর বিলম্ব করিতে পারিল না, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। পরণের নূতন সাড়ী খস্‌খস্ করিয়া ও হাতের নূতন পরিহিত ঢাকাই শাঁখার বালা একবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া একটু খানি গম্ভীরচালে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সে যে নূতন জিনিষগুলা অঙ্গে পরিয়াছে তাহার উপর আমার ক্ষীণ দৃষ্টি যাহাতে নিবদ্ধ হয় সে বিষয়ে তাহার বেশ একটু সতর্কতা দেখিলাম। কিন্তু প্রশংসাসূচক শব্দগুলা আমার ওষ্ঠাগ্রে পৌছিবার পূর্ব্বেই সে চলিয়া গেল।

আজ এই শরৎ প্রভাতের নিদ্রাঘোরে এই পরিচিত কচি হাতখানির একটি কোমল স্পর্শ সহসা এতকাল পরে যে দিনের স্মৃতি পুনর্জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছিল, সেদিন আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। তাহা আমার জীবন ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম যৌবনের নূতন উচ্ছ্বাসপূর্ণ কাহিনী। এখন আমার বয়স ৭০এর উপর; তখন

এই আমিই ২৬ বৎসরের যুবা পুরুষ ছিল। তো আর সহ্য হয় না।"
অতিবাহিত হইয়াছে। স্থ মলিন হইয়া গেল,

আমাদের বাড়ী এই গ্রামেই। এই সুজলা শ্বাস ফেলিয়া সে ক্ষুণ্ণ *শস্যশ্যামলা পল্লীখানি তখন এমন করিয়া* ডি, গুপ্ত কর না কেন?" বিক্রেতার খাসমহল হইয়া দাঁড়ায় নাই। ছোলা আদাহ তাহাকে পলতা লতার চেয়ে তখন গ্রামবাসীরা অন্য খাদ্যেরও বেশি ভক্ত সবচেয়ে তখন সুবিধা ছিল যে, গ্রামে ফাঁড়িদারের আস্তানা কি রেলওয়ের তখনও সৃষ্টি হয় নাই। তখনকার লোকেরা কথায় কথায় পুলিশ ডাকিতে সুযোগ পাইত না, মণিহারীর দোকান লুট করিয়া ঘরে তুলিবার তখন সুবিধাই ঘটিত না, ভাইকে ভাইএর নামে ফৌজদারী না করিয়া তখন বিবাদ করিলে সালিসী মানিতে হইত, তখনকার লোকেরাও মাতাল হইত বটে তবে তাহাতেও পয়সা খরচটা কিছু কম হইত। কারণ আদত ফ্রেঞ্চ মদ্যের এ গ্রামে আমদানীর সুযোগ ছিল না। সেই আমাদের সেকেলে গ্রামখানি এখন তোমাদের মনে বিভীষিকার উদয় করিতেছে বটে, কিন্তু আমাদের চোখে সে বড়ই আদরের ধন ছিল।

যখনকার কথা বলিতেছি, তখন আমি কলিকাতায় চাকরী করিতাম। সমস্ত হপ্তাটি সেখানে যেমন কেন থাকি না শনিবার রাত্রি দশটার সময় নৌকা হইতে নামিলেই মনে একটা নূতন উদ্যম ও বল জাগিয়া উঠিত। তারপর প্রতীক্ষিত দুইখানি হৃদয়ের স্নেহসেবায় শ্রান্তি ক্লান্ত মুহূর্তে অবসিত হইয়া যাইত।

আসিয়া গোপনে বলিতাম, "মন্দা তুমি কি ওষুধ জান বলো দেখি। তোমার হাতখানা গায়ে পড়্বামাত্র আমার সমস্ত পরিশ্রমের

দল তখনও প্রভাতবন্দনা তে মা ও স্ত্রী ছাড়া আর আমার কেহই নাতিনী হাসিয়া হাসিয়

অপ্রতিভ হইয়া লয়া রাখা ভাল যে আমি নিঃসন্তান। মা ইহা করিলাম— া সর্ব্বদাই অবিবেচক একচোখো দেবতা ও আমার স্ত্রী

"তুই রস্কার করিতেন, এবং 'এই বাঁজা তালগাছ আমি নিয়ে কি গা!' এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া সে বেচারাকে মনঃপীড়িত করিতেও ছাড়িতেন না। ঠাকুর দেবতা ও সন্ন্যাসী ফকিরের ঔষধ, মন্ত্র, কবচ, মাদুলিতে যখন কিছুই হইল না, তখন হতাশ হইয়া শেষে আমায় ধরিয়া পড়িলেন, বলিতে লাগিলেন, "বিপিন, তুই আবার বিয়ে কর্।" আমি কথাটা প্রথমে হাসিয়াই উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিলাম। পরে চুপ করিয়া থাকিলাম, অবশেষে রাগ করিলাম, কিন্তু তাঁহাকে কোন মতেই বুঝাইতে পারিলাম না যে;—পুত্র কন্যা না জন্মিলেও মানুষের বেশ সুখ শান্তিতে দিন কাটিতে পারে। মা কিছুতেই থামিলেন না; প্রতিদিনই তাঁহার অনুরোধ, উপরোধ, কান্নাকাটি বরং বাড়িয়াই চলিল। যে গৃহ আমার শান্তিকানন ছিল, এখন দিনে দিনে তাহাই বিষতিক্ত হইয়া উঠিল। আর যেন সেখানে তিলার্দ্ধও তিষ্ঠিতে ইচ্ছা করে না।

একদিন স্ত্রীকে বলিলাম, "মন্দা! আমি এখন আর দিন কতক বাড়ী আস্‌বো না মনে কর্‌ছি; তুমি আমার জন্য ভেবো না যেন।"

মন্দাকিনী একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?" আমি উত্তর দিলাম, "দেখ্‌তে পাও না আজকাল মা বড্ডই বাড়াবাড়ি জেদ আরম্ভ করেছেন।"

"তা তো জানি, তা সে জন্য বাড়ী আসা বন্ধ কর্‌বে কেন?"

"কি করি বল, ক্রমাগত মা'র কান্নাও তো আর সহ্য হয় না।"

মন্দাকিনীর মুখখানা অকস্মাৎ অত্যন্ত মলিন হইয়া গেল, যেন অন্তঃস্থলের অভ্যন্তর হইতে একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিয়া উঠিল—"বেশ তো তাঁকে তা' হ'লে খুসীই কর না কেন?"

আমি তাহার অভিমান-ক্ষুণ্ণ মুখের দিকে চাহিয়া সাগ্রহে তাহাকে বুকে টানিয়া বলিলাম,—

"তাই কি মনে হয় মন্দা? আমায় এম্‌নি পাষণ্ড ব'লেই কি তুমি মনে করো?"

একান্ত নির্ভরতার সহিত আমার হাত দুইটা হাতের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সে যেন বড় আশ্বাসে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"না, সে যেদিন মনে কর্‌বো সেই দিন আমি মর্‌বো।"

তাহাই করিলাম; দুই হপ্তা আর বাড়ী গেলাম না। এই সময় সুক্ষণে কি কুক্ষণে জানি না—আমার উপরওয়ালা পেনসন লওয়ায় আমার পদোন্নতি হইল। তখনকার বাঙ্গালী গৃহস্থের ২৫৲ টাকা মাস-মাহিনা নিতান্ত অল্প আয় নহে, কারণ তখন টাকায় ১৫ সের করিয়া চাল বিক্রয় হইত না, দুধের নির্জ্জলা ভাগের দামই ছিল এক আনায় এক সের। বাড়ী গিয়া মাকে সুসংবাদে তুষ্ট করিলাম, মা প্রসন্ন মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তাই জন্যে বুঝি কদিন আস্‌তে পারিস্ নি?"

মাথা নীচু করিয়া একটু হাসিয়া কাশিয়া উত্তরটাকে চাপিয়া ফেলিলাম। কিন্তু তাহাতে যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টান্তে পাপ হইতে বিরতি ঘটিল বালয়া বড় ভরসা রহিল না। মন্দার সহিত পরামর্শ করিয়া মাকে বলিলাম--

"বারমাস আর এমন ক'রে একা একা প'ড়ে থাক্‌তে পারিনে, একটা বাসা করি, তোমরাও সেখানে চল।"

মা এই প্রস্তাবটা উঠিতেই ঘোর আপত্তি তুলিলেন, বলিলেন—"তাও কি হয় রে! ঘরসংসার ঠাকুর দেবতা এ সব কে দেখে কে শোনে,—তা কি ক'রে হবে? তা ছাড়া সে শুনেছি নাকি মেলেচ্ছর দেশ। সেখানে গেলে নাকি জাত জন্ম কিছুরই আর বিচার থাকে না।"

অবশেষে গঙ্গাস্নান ও কালীদর্শনের লোভে মা কলিকাতা যাইতে সম্মত হইলেন। স্থির হইল নবান্নের পর একদিন বাসা ঠিক করিয়া আসিয়া তাঁহাদের লইয়া যাইব। ফিরিবার সময় আমার স্ত্রী বলিল—"শীঘ্র শীঘ্র নিয়ে যেও, একা একা আর আমি থাকৃতে পারিনে।"

আদর করিয়া তাহার বিরহাশঙ্কায় ম্লান মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া বলিলাম, "তা আর বল্‌তে হবে না গো, সেটা যেন কেবল তোমারি, আমার যেন কিছু নয়!"

একটি চলনসই রকম বাড়ী শীঘ্রই পাওয়া গেল। তখন কলিকাতার ছোট বাড়ীর ভাড়া এখনকার মত অগ্নিমূল্য হইয়া উঠে নাই। ১৫ টাকা ভাড়াতে বেশ বাসোপযোগী বাসা পাইলাম। কিন্তু একি বিড়ম্বনা! দেশে আসিয়া শুনিলাম এক আত্মীয়ের বাড়ী বিবাহ, মা সে বিবাহে উপস্থিত না থাকিলে কিছুতেই নাকি চলিবে না! আমি কলিকাতায় লইয়া যাইতে জেদ করিলে মা বলিলেন,—"তা কি হয়! তা হ'লে লোকে বল্‌বে চাক্‌রে ছেলের গুমোরে জ্ঞাত কুটুম মান্‌লে না। বাপ্‌রে তোকে কেউ গা'ল দেবে—সে আমি সহ্য কর্‌তে পার্ব্বো না।"

গালি খাওয়ার চেয়েও অধিকতর ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসিলাম। নন্দাকে বলিলাম,—"তুমিই না হয় চল, মা'র যাবার ইচ্ছা নাই।"

সে চোখের জল গোপন করিয়া গম্ভীর মুখে ঘাড় নাড়িল—"আমি কি ক'রে যাবো? তাতে লোকে নিন্দা করবে, মা রাগ করবেন।" বলিতে বলিতে চোখ দিয়া তাহার টস্ টস্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। পুত্রহীনা তাহার প্রাণের সবটুকু প্রেমই যে এই একটি জায়গায় উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল!

সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো; এবার এসে নিশ্চয়ই মা'র মত করাবো।"

আমার বাসার দক্ষিণে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা ভিতর বাহিরে নূতন ধরণের সাজসজ্জা পরিয়া দণ্ডায়মান ছিল। প্রথম দিনেই জানিয়াছিলাম সে বাটী এক পূর্ব্বাঞ্চলবাসী ধনাঢ্য জমীদারের তাঁহার নাম হীরালাল ঘোষাল।

একদিন সন্ধ্যার সময় ঘরে বসিয়া একখানা পুস্তক পড়িতেছি,—মন অত্যন্ত নিবিষ্ট থাকাতে কখন অস্তগত সূর্য্যের শেষ রক্তিমাটুকু ঢাকিয়া ফেলিয়া তাহার স্থানে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া নিবিড় হইয়া আসিয়াছে তাহা জানিতেও পারি নাই। অবশেষে যখন লেখার অক্ষরগুলা চোখের সম্মুখে অস্পষ্ট হইয়া আসিল, তখন মুখ তুলিয়া এই পরিবর্ত্তনটুকু বুঝিতে পারিলাম। একজন বন্ধুর বাড়ী সন্ধ্যার পূর্ব্বেই যাইবার কথা ছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইতেই পার্শ্বের ছাদে দৃষ্টি পড়িয়া গেল। একটা মধুর কলহাস্য ও মলের রুণু ঝুণু ধ্বনি ইতিপূর্ব্বেই মধ্যে মধ্যে কানে আসিতেছিল, এখন দেখিলাম সেই তানলয়সমন্বিত শব্দসমূহের সৃষ্টিকারিণী কয়েকটি ছোট বড়

মেয়ে। একটি কিশোরী আর একটি ছোট মেয়েকে ধমক দিয়া বলিতেছিল,—"আঃ স্বর্ণ! কি ছুটাছুটি কর্‌ছিস্, ওখানে একজন বাবু রয়েছেন, তিনি কি মনে কর্‌বেন বল্ দেখি?"

স্বর্ণ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "ওটা যেন মেজদির্ শ্বশুর বাড়ী তাই কি মনে কর্‌বে ব'লে ওর এত ভয় হচ্চে!"

আমি তাহাদের পানে চাহিয়াই চোখ ফিরাইয়া লইয়াছিলাম, কিন্তু এই মন্তব্য শুনিয়া একবার না চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না। দেখিলাম, উপহাস্যাস্পদ 'মেজদি' আরক্তমুখে আমার দিকে একবার কটাক্ষ করিয়াই লজ্জায় মুখ নীচু করিয়া লইল। আমিও আর সেখানে দাঁড়াইলাম না।

শুনিয়াছিলাম হীরালাল বাবুর মেয়ে অনেকগুলি, আর সবগুলিই প্রায় অবিবাহিতা। তাহার কারণ কতকটা হীরালাল বাবুর নব্যতন্ত্র-প্রিয়তা এবং অনেকখানি তাঁহাদের কঠোর কৌলীন্য। তাঁহাদের স্বঘরে সুপাত্র নাকি তখন একপ্রকার দুষ্প্রাপ্যই ছিল।

নূতন বাসায় আসিবার পর একমাস হইয়া গিয়াছে। পৌষ মাস, লক্ষ্মীপূজা ইত্যাদি নানা কারণে মা বাড়ী ছাড়িয়া আসিতে সম্মত হন নাই, আমি এখনও যে একাকী সেই একাকীই।

কিন্তু একা হইলে কি হয় পাশের বাড়ীর ছেলেমেয়েদের কল্যাণে আমার নির্জ্জন বাসা বড় একটা নিস্তব্ধ থাকিতে পায় না। তাহাদের পাঠের ধ্বনি, মেয়েদের মেম শিক্ষয়িত্রীর যিশুর গান এবং তাহাদের সমন্বিত কণ্ঠে "There is a happy land far away" ইত্যাদি আমার ঘরখানিকে সর্ব্বদা মুখরিত করিয়া রাখিত। স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে

হীরালাল বাবুর খুব বেশী রকম অনুরাগ ছিল। মেয়েদের লেখাপড়া তখনকার দিনে আজিকালিকার মত এতটা সুলভ ছিল না, তাই হীরালাল বাবুর মেয়েরা এ বিষয়ে একটু নাম কিনিয়া ছিলেন। ঠিক আমার সম্মুখের ঘরেই তাহারা সকাল সন্ধ্যায় পড়িতে বসে ;—এজন্য অনেক সময় আমাকে আমার ঘরের জানালার নিকটে গিয়া অপ্রতিভ ভাবে ফিরিয়া আসিতেও হইয়াছে। মেয়েগুলি কুমারী হইলেও সব কয়টিকেই আর বালিকা বলা চলে না। হীরালাল বাবুর দুইটি ছেলে। বড় ননীলাল কোথাকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া গিয়াছে, ছোটটি হিন্দু স্কুলে পড়ে। লোকে বলিত,—হীরালাল বাবুর বাড়ী লক্ষ্মী সরস্বতী একসঙ্গে বাঁধা আছেন।

সরস্বতী পূজার পর মা আসিলেন। এবার আমি নিজে আনিতে যাই নাই, আমার এক কলিকাতা দর্শনলোলুপ জ্ঞাতি ভ্রাতাকে ভার দিয়াছিলাম। মা আসিলেন, কিন্তু মন্দার আসা হইল না। আমাকে বিস্মিত দেখিয়া মা আপনিই বলিলেন,—"বউমা'র মা'র বড্ড ব্যায়রাম ব'লে তাঁকে নিতে লোক এসেছিল ; কি করি না পাঠালেও তো ভাল দেখায় না। কন্যে পুত্তুর লোকে আর কিসের জন্যে কামনাই করে এই সব সময়ের জন্যই তো!" মুহূর্ত্ত মধ্যে কল্পনার মধুর চিত্রখানার উপর কালি পড়িয়া গেল। মা'র উপর ক্ষুণ্ণ অভিমানে নীরব হইয়া রহিলাম। মা সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া বলিলেন,"রাগ কল্লি?"

নিবিড় অভিমানে উত্তর দিলাম, "না রাগ কিসের!"—মনে মনে বলিলাম, "যদি তুমি আগেই চ'লে আস্‌তে তা হ'লে তো আর এ বাধা উপস্থিত হ'ত না। তোমাদের আর কোন কিছুই ভাল দেখায় না, কেবল যত ভাল দেখায় আমায় দুঃখ দেওয়া।"

একদিন সন্ধ্যার পর নিজের নির্জ্জন বৈঠকখানায় বসিয়া ভাবিতেছি—"মন্দাকে আর কতদিন সেখানে রাখিব? অথচ তাহার মায়ের অসুখ এখনও তো সারিল না। কি-ই বা উপায় করা যায়?"

এমন সময় বাহির হইতে কে আমায় ডাকিল, "বিপিন বাবু! বাড়ী আছেন?"

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে না চিনিলেও গলার স্বরে হীরালাল বাবুকে চিনিতে পারিয়া সাশ্চর্য্যে শশব্যস্তে উঠিয়া গেলাম। যথোচিত আদর আপ্যায়িতের পর তিনি প্রথমে বাজে কথাই কহিতে আরম্ভ করিলেন। কতদূর পড়িয়াছি? বাড়ী কোথায়? বর্ত্তমান সমাজ,—ইত্যাদি অনেক কথার পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি নাকি বিবাহ কর্‌তে চাও?" আমি বিস্ময়ের সহিত কহিলাম, "কে আপনাকে একথা বলেছে?" আমার স্বরে অথবা দৃষ্টিতে তিনি একটু যেন অপ্রতিভ হইলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন, "শুন্‌লাম সন্তান হয় নাই ব'লে তুমি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ কর্‌তে ইচ্ছুক।"

সাবধানে উত্তর দিলাম,—"মা'র সেইরূপ ইচ্ছা বটে. কিন্তু আমি তাতে সম্মত নই।"

হীরালাল বাবু আমার মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে কহিলেন, "কেন বাপু! তোমার মায়ের এ ইচ্ছা তো কিছু অসঙ্গত নয়! বংশরক্ষার জন্য তোমার আবার বিবাহ করাই তো উচিত।"

কি গ্রহ! একজন অপরিচিত সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহারও আমাকে এই উচিত শিক্ষাটুকু দিবার জন্য অনিদ্রা রোগ জন্মিয়াছে! বিনীতভাবে উত্তর করিলাম,—"আপনার মুখে একথা সাজে না। আপনি স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যথেষ্ট উদারতা ও সহৃদয়তা প্রদর্শন করেন

শুনেছি। আমার নিরপরাধিনী পত্নীর প্রতি এতে যে অত্যাচার হবে, তার জন্য দায়ী কে? পিতৃপুরুষগণ অবশ্যই আমাকে এ জন্য ক্ষমা করবেন।"

উত্তেজিত স্বরে আমার মাননীয় অতিথি বলিয়া উঠিলেন, "থাম, বাপু! তোমরা নব্যরা সব জিনিষের কেবল একটা দিক দেখ। স্ত্রীশিক্ষা এক জিনিষ ও কুলধর্ম্মপালন অন্য। শিক্ষার সহিত ধর্ম্মকে এক ক'রো না। স্ত্রীর চেয়ে পিতৃপুরুষকে ছোট করলে তাতে যে মহা অধর্ম্ম হবে! আমরা সেকেলে লোক সব সইতে পারি, ধর্ম্মের অবমাননা সইতে পারি না। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' ইহাই শাস্ত্রের বচন। নিজের ভোগের জন্য স্ত্রী নয়।" এই বলিয়াই তিনি উঠিলেন।

আমিও উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে চলিতে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কিন্তু আপনি এসকল কথা আমায় কেন বলছেন?"

তিনি কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর দৃষ্টি নামাইয়া বলিলেন—"না তেমন কিছু নয়, কথাটা শুনেছিলাম, তাই তোমায় একবার জিজ্ঞাসা করলাম। বিশেষ তুমি যখন আমার পাড়ায় এসেছ পরস্পরের সংবাদ সর্ব্বদা তো রাখা উচিত।"

বুঝিলাম কিছু গোপন করিলেন। একবার একটা সম্ভাবনার কথা মনে উদিত হইল। কিন্তু কি অভাগ্য! সে কোন কাজের কথাই নয়।

৩

মা আসার পর রোজ রোজই আমাদের প্রতিবাসী-মেয়েরা বেড়াইতে আসিতে লাগিলেন। প্রায় প্রতিদিন ভাল ভাল মিষ্টান্ন, উত্তম ফল ইত্যাদি আমাদের বাড়ী তত্ত্ব আসিতে আরম্ভ হইল। হীরালাল বাবুর স্ত্রী

তাঁহার গঙ্গাস্নান ও কালীদর্শনে প্রায়ই মাকে সঙ্গিনী করিতেন। সিদ্ধেশ্বরী, মদনমোহন দর্শনেও বঞ্চিত করিতেন না। নিত্য সেখান হইতে পূজার ফুল বিল্বপত্র ও গঙ্গামৃত্তিকা গঙ্গাজল আসিত। মেয়েরা তাঁহার পাকা চুল তুলিয়া দিয়া উপকথা শুনিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিত। ছোট খুকিটি তাঁহার কোলে নহিলে নাকি ঘুমাইতে চাহিত না। এমনি অনেক একই বাধ্য বাধকতার মধ্য দিয়া তাঁহাদের প্রণয় নিতাই চন্দ্রকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ক'দিনেই তাঁহারা মিষ্টান্ন ও মিষ্টকথায় মাকে এমনি বশ করিয়া লইলেন যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যে কয় ঘণ্টা গৃহে থাকিতাম তাঁহাদের সুখ্যাতি শুনিতে শুনিতে আমার তো প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিল।

*অধর্ম্ম কথা বলিতে নাই—সমাদরটা যে মা'ই একা ভোগ করিতে-*ছিলেন তাহাও নয়। আমিও ইতিমধ্যে কোন না কোন একটা উপলক্ষে দুই তিন বার বড়লোকের অন্দরে জামাই-আদরে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়াছি। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, খাদ্যদ্রব্যের প্রচুরতর আয়োজন সত্ত্বেও চারিদিকের দ্বারান্তরালবর্ত্তী অস্ফুট হাস্যসংযুক্ত ফুস্-ফুসানি ও অলঙ্কারশিঞ্জন আমার হস্ত ও জিহ্বাকে কেমন যেন জড়িত করিয়া তুলিত ও উদরে যথেষ্ট ক্ষুধা থাকিতেও পাতে যথেষ্ট আহার্য্য ফেলিয়া উঠিতে হইয়াছিল।

সেদিন সকাল সকাল আফিস্ হইতে আসিয়া হাত মুখ ধুইয়া সবেমাত্র জলযোগ করিতে আসনে আসিয়া বসিয়াছি, এমন সময় আমার পেছনদিক হইতে কে ডাকিল, "মাসিমা!" ফিরিয়া চাহিতেই দেখিলাম হীরালাল বাবুর বাড়ীর জানালার নিকট হইতে সেই মেয়েটি সরিয়া গেল। তাহার সাড়া পাইয়া মা তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া বলিলেন,—

"কি বল্‌চো মা হিরণ? বলো না। বিপিনকে আবার লজ্জা!"

"মা আজ সন্ধ্যাবেলা আপনাকে একবার এবড়ীতে-আস্‌তে বল্লেন, যদি আস্‌বার সুবিধা হয়তো ঝিকে পাঠাবেন"।

অন্তরাল হইতে এই কথাগুলি শুনা গেল। মা উত্তর করিলেন "তা যাবো মা, যাবো"।

মাকে হীরালালবাবুর স্ত্রী দিদি বলিতেন, এই সম্পর্কে তিনি তাঁহার ছেলেমেয়েদের মাসিমা। মা ফিরিয়া আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে মা?"

মা বলিলেন "ওবাড়ীর বাবুর মেজ মেয়ে। দেখিস্‌নি মেয়েটি না?"

"হ্যাঁ, তা ওঁর কোথায় বিয়ে হয়েছে?"

"বিয়ে! বিয়ে তো হয়নি। ওঁরা মস্ত কুলীন কিনা—এই, এই ঠিক আমাদেরই পাল্‌টি ঘর, তাই অমন মেয়েরও বর মিল্‌ছে না।"

মা'র এই কথায় আমি যেন চমকিয়া উঠিলাম। সেদিন সহসা হীরালালবাবুর আগমন ও আমার প্রতি তাঁহার অযাচিত উপদেশের অর্থ এখন পরিষ্কাররূপে বোধগম্য হইয়া গেল। একটু হাসিও আসিল, সকলেই নিজের স্বার্থ বুঝিয়া উপদেষ্টা হন! এমন সময় মা বলিলেন—

"বাবা, আমার ত দিন ফুরিয়ে এলো, খেয়া নৌক ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে; একবার চ'ড়ে বস্‌লেই হয়। তা এসময়েও কি তুই আমার শেষ সাধ পূর্ণ কর্‌বি নি' রে? তুই যখন এক বছরের তখন তোর মামা মারা যান, তোর বাপ তো মরণের তিন দিন আগে পর্য্যন্ত আমাদের উদ্দিশটিও নেন নি। সেই তোকে কত দুঃখে, কত কষ্টে মানুষ কর্‌লুম;—কাট্‌না কেটে পড়ালুম, বে' থা দিলুম, মনে বড়ই আশা ছিল, যে, পৌত্তুরের মুখটি দেখে মনিষ্যি জন্ম সার্থক ক'রে মর্‌বো, তা

সে সাধে তো বিধাতা আমার ছাই ফেল্লেন। তা, বাবা বিপিন! কখনও তো তোর কাছে মা ব'লে কিছুই দাবী করিনি,—এই কথাটা তুই কি কিছুতেই আমার রাখ্‌বিনি ?”

আজ মার কাতরস্বরে আমি যেন আর অবিচল থাকিতে পারিলাম না, দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম—

“আচ্ছা মা! না হয় তোমার কথায় আবার বিয়েই আমি কর্‌লাম, কিন্তু মনে কর এবারও যদি সে বউএর ছেলে না হয় ?”

মা যেন ঈষৎ আশ্বস্ত হইলেন,—তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, “তা নিশ্চয় হবে, নিশ্চয় হবে, গণৎকাররা তো সবাই বল্‌ছে যে বৌমাই বাঁজা।”

সন্দিগ্ধ ভাবে আবার বলিলাম, “না না, বেশ স্বস্তিতে আছি, মিথ্যে কেন সাধ ক'রে ঝগড়া কোঁদল ঘরে ডেকে আনা, তা' ছাড়া লোকেই বা এতে ব'ল্‌বে কি ? অমন ঝঞ্ঝাটে আর কাজ নাই।”

“তা আর না! লোকে কি বল্‌বে ? কুলীনের ছেলের যে একটা বে' করায় গাল লাগে তা জানিস্ ? তোর বাপ পিতেম'র কত-গুলো ক'রে বে' ছিল, শুনেছিস্ তো ? একোজনের তখন দু'পণ দেড়-পণের কম তো থাক্‌তই না, বরং আরও বেশি। লক্ষ্মী বাবা আমার! আর অমত করিস্‌নে ; ওঁরা বড়ই ব্যস্ত হ'য়েছেন, আজই তা' হ'লে আমি ওঁদের বলি গিয়ে।”

আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম—

“কাঁ'রা ব্যস্ত হয়েছেন ? কি তুমি বলছ মা আমি তো কিছু বুঝ্‌তেই পারছি না !”

মা-ও বিস্ময়ের সহিত বলিলেন,—

"কেন হীরালালবাবু তোকে কি বলেন নি? তাঁরা যে হিরণের সঙ্গে তোর বে' দিতে চান!"

আমার বিস্ময় বর্দ্ধিত হইল,—"সে কি! অমন মেয়ে তাঁরা সতীনের হাতে দিতে চান কি দুঃখে?"

মা ঈষৎ গর্ব্বের হাসি হাসিলেন,—

"যা, যা তুই আর জ্বালাস্‌নি বিপিন; কুলীনের ঘরে অমন পাত্তর ক'টা আছে তাই আমায় তুই বল্‌তো? সতীন! কুলীনের মেয়ের একটা সতীন আবার সতীন কি? ফি লোকের যে তখনকার কালে সতেরগণ্ডাই সতীন থাক্‌তো!"

মা'র কথায় হাসিয়া ফেলিলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা উনি কি কুলটুল মানেন না কি?"

মা বলিলেন, "ওমা তা আর মান্‌বে না! তুই কি যে পাগলের মতন বলিস্‌ বিপিন, মেয়েদের ইঞ্জিরি, মিঞ্জিরি, পড়ায় ঐ যা,—নইলে এদিকে ওরা খুব হিঁদু! মা রয়েচে কিনা, দেশে দোল দুর্গোৎসব সবই হয়। তা তুই বিয়ে করবি কিনা আমায় সে কথাটা এখন খুলে বল্‌ দেখি? আহা মেয়ে ত' না, যেন ইন্দির ভুবনের পরী!"

তা সত্য কথা বলিতে কি, মেয়েটার এই পরীত্বটুকু আমিও লক্ষ্য করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার সৌন্দর্য্য অপেক্ষা তাহার সলজ্জ দৃষ্টির বিশ্বস্ত আত্মীয়তাভাবটাই আমাকে বুঝি একটু বিপদগ্রস্তও করিয়া ফেলিয়াছিল। সে দৃষ্টি যতই মনে পড়িতেছিল, তাহার মধ্যস্থ ওই সুকুমার হৃদয়ের নবীন আশা, বিশ্বাস, নবপ্রস্ফুট প্রেমভাব প্রকাশিত দেখিয়া,—একটি সুকোমল করুণায় আমার হৃদয় মন যেন আর্দ্র হইয়া উঠিতেছিল। মা আমাকে নীরব দেখিয়া কি ভাবিলেন

কে জানে; আবার বলিলেন,—“মন ঠিক ক'রে ফেল্ বাছা; আর 'না' বলিস্‌নে।”

আমি এই কথায় অকস্মাৎ যেন চমকিয়া উঠিলাম! নিজের মনের এই ক্ষণিক দুর্ব্বলতায় অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়া বলিলাম, “না মা তা কি কখন হয়! তা' হ'লে—” মা আমাকে আর কিছু বলিতে না দিয়া বলিলেন,—“ও কথা আমি শুন্‌বো না বাছা! তোকে এ বিয়ে কর্‌তেই হবে। আমাকে ওরা ডাক্‌ছে আমি এখন যাই।”

মা চলিয়া গেলেন, আমি ভাবিতে লাগিলাম,—“না না, মন্দার নিকট অবিশ্বাসী হইতে পারিব না। সেকালের নিয়ম সেকালে চলিতে পারে, তাহা একালে আর চলে না। বিধাতা যে অভাগিনীকে মাতৃত্বের গৌরব-আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, আমি তাহাকে কোন্ প্রাণে স্বামিপ্রেম হইতেও বঞ্চনা করিব? ভগবান্ আমাকে এই পাপ-চিন্তা হইতেও যেন রক্ষা করেন। হিরণ্ময়ীর অতুল রূপ, শিক্ষা, সম্পদ অনেক আছে, তাহার ভাবনা কি? মন্দার আমার যে,—আমি বই আর কিছুই নাই।”

৪

ফাল্গুন মাস গিয়া চৈত্র ও চৈত্র মাস গতে বৈশাখ মাস আসিয়া পড়িল, কিন্তু মন্দার আর এখানে আসাই ঘটিল না। তাহার মায়ের রোগ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিতেছে, গ্রাম্য কবিরাজ বলিয়াছেন, 'আর বেশি দিন রোগী টিঁকিবেন না।' মায়ের ইচ্ছা,—মৃত্যুকালে কন্যা তাঁহার কাছেই থাকে। আমার শাশুড়ীর দুইটি কন্যা সন্তান ভিন্ন আর কোন

সন্তান ছিল না। উভয়ের মধ্যে মন্দাই ছোট। বড়মেয়ে মোহিনী অগণ্য সপত্নীশ্রেণীর মধ্যে সন্তানের মাতা বলিয়া নিজের সিংহাসন স্বামী গৃহে অটল করিয়া লইয়াছিল। সে স্থান বে'দখলের ভয়ে দুদিনের জন্যও তাহা ত্যাগ করিয়া আসিতে পারে না, কাজেই মন্দা না থাকিলে তাঁহার মুখে জল দেয় এমন কেহই ছিল না।

দোলের বন্ধে তাহাদের বাড়ী গেলাম। ফিরিবার সময় শাশুড়ীর অবস্থা দেখিতে ফিরিতে কষ্ট বোধ হইতেছিল, কিন্তু উপায় নাই আমি পরের চাকরি করি; তা ভিন্ন মা-ও আমায় কখন ত্রিরাত্রি শ্বশুরালয়ে বাস করিতে দেন না। তাঁহার বিশ্বাস ত্রিরাত্রি শ্বশুরের অন্ন গ্রহণ করিলে না কি মানুষ আর মানুষ থাকে না। তখন সে বশতাপন্নতা-শক্তিতে ভেড়ায় রূপান্তরিত হইয়া যায়। কাজেই তিনি তাঁর ছেলের মানুষত্ব বজায় রাখার জন্যই ইহার বিরুদ্ধাচরণ পছন্দ করেন না। বিদায়কালে সেদিন মন্দা ম্লানমুখে বলিল,—

"আবার মধ্যে মধ্যে এসো, আমাদের আর দেখ্‌বার কে আছে!" বলিলাম, "মাকে না হয় কলিকাতায় নিয়েই চলো না।"

সে এ প্রস্তাবে সাগ্রহে সম্মত হইলেও শাশুড়ী কোন মতেই কিন্তু জামাইবাড়ী আসিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যাই একা ফিরিয়া আসিলাম। দূর হইতে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, মন্দা উষাকালের পল্লবিনী-লতার ন্যায় কুটীর-দ্বারে নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দেখা যায় সে তেমনি নিশ্চল দাঁড়াইয়া রহিল। অনুতাপে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাহার বিষাদ-মলিন মুখের ছবিখানা মনের ভিতর আনিয়া নিজেকে শতবারই ধিক্কার দিলাম।

জ্যোৎস্নারাত্রে সম্মুখের বারান্দায় মাদুর পাতিয়া মা শুইয়াছিলেন।

আমি কাছে গিয়া বসিলাম। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মা কোন-কথ বলিলেন না ; মনে হইল, তিনি এমন কিছু বলিতে চাহেন, যাহার জন্য চেষ্টা করিয়া কথা খুঁজিতে হইতেছে। আমিও চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তারপর হঠাৎ মা বলিয়া ফেলিলেন ;—

"এদিককার তো সবি একরকম ঠিক হ'য়ে গেছে ; কালই তবে গায়ে হলুদ দেওয়া যাক্ ?"

আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম ; নির্ব্বাক্ হইয়া মা'র দিকে চাহিলাম। মা বলিলেন,—

"তোকে বলিনি বাছা,—তাতে আর হ'য়েছে কি ? তাদের ধরা পাকড়ায় আমি কথা দিয়ে ফেলেছি। আর তোকেও তো সেদিন নিমরাজি গোছ দেখ্‌লুম। তা এই পরশু সন্ধ্যাবেলাই শুভ লগ্ন আছে কোন গোল হবে না, চুপিচাপি সব হ'য়ে যাবে।"

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, "না মা, আমি বিয়ে কর্‌ছি নি।"

মা বলিলেন, "সেও কি একটা কথা হ'ল ! আমি যে নিজে গিয়ে মেয়েকে আশীর্ব্বাদ ক'রে এসেছি। কাল গায়ে হলুদ। তা আমি ঘটা পটা কিছুই তো কর্‌বো না। কেবল একখানি রাঙ্গাপেড়ে সাড়ী আর একটি রূপোর বাটি ক'রে একটু হলুদ মাত্র পাঠাব। আর কিছু এখন না,—"

"কেন তুমি আমায় না ব'লে কয়ে এত বড় কাণ্ড করেছ ? একি অন্যায় কথা ! আমায় একবার জানাবারও কি দরকার হ'লো না ? তা' যা করেছ, বেশ করেছ, আমি কিন্তু বিয়ে কিছুতেই কর্‌ছি না।"

মা রাগিয়া বলিলেন, "তবে যা খুসী তাই করোগে বাছা !

আমার যেমন মরণ নেই তাই তোমাদের কথায় থাক্‌তে গেছলুম। এখন কি আর আমি সে তোমার দুঃখের দিনের [illegible] আছি! এখন আমার কথা থাক্‌বে কেন? একটা দাসী বাঁদী আমি,—আমি কোথাকার কে যে, আমার কথা থাক্‌বে! ঘাট হয়েছে, আর কখনও কিছু তোমায় আমি বল্‌বো না বাছা, তোমার বৌকে এনে তোমাদের ঘরকন্না তোমরা সব বুঝে সম্‌ঝে নাও, আমি বাড়ী চ'লে যাই।"

মা নিজের ঘরে গিয়া ঝনাৎ করিয়া দরজায় খিল দিয়া দিলেন। কথাগুলা মনে বড়ই বিঁধিল, তথাপি [illegible] না। আমি তো তাঁর কাছে যথার্থ কোন অপরাধে অপরাধী নই! এতে তিনি রাগ করিলে কি করিব? একজন মানুষের হৃদয়টাকে তো আর দুইভাগ করা সম্ভব নয়, বিবাহ একজনকে ভিন্ন দুইজনকে করা যায় না। এ বিবাহ আমার পক্ষে অসম্ভব! তা' ইহাতে আমায় যত লাঞ্ছনা সহিতে হয় সবই সহিব, কিন্তু তথাপি এ বিবাহ কোনমতেই করিতে পারিব না।

সমস্ত রাত জাগিয়া চুপ করিয়া সেইখানেই বসিয়া রহিলাম। চাঁদ ডুবিয়া গেল, নক্ষত্রসকল ক্রমে ক্ষীণজ্যোতিঃ হইয়া আকাশের অনন্ত নীলিমার মধ্যে একে একে মিলাইয়া পড়িতে লাগিল, রাস্তায় গাড়ী ঘোড়ার শব্দ জাগিয়া উঠিল, আমি ঘরে আসিয়া ক্লান্ত মস্তক বাম হস্তে রক্ষা করিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িলাম। ক্রমে কোন সময় চোখ দুইটা তন্দ্রায় জড়াইয়া আসিল। তারপর হঠাৎ উষাকালে জানালার দিকে চুড়ির শব্দে চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলাম, পাশের বাড়ীর সম্মুখের ঘরেই কি একটা কাজ লইয়া হিরণ্ময়ী প্রবেশ করিয়াছে,

তাহার দিদি তাহাকে সেইখানেই ধরিয়া ফেলিয়া কাণে কাণে কি একটা বুঝি তামাসা করিতেছেন, তাই তাঁহাদের দু'জনের মধ্যে একটা সোহাগের টানাটানি হইতেছিল। সহসা আমার উপর চোখ পড়ায় সে একটুখানি সলজ্জ মধুর হাসি হাসিয়া পরমুহূর্ত্তে পলাইয়া গেল।

আবার সেই প্রাণভরা বিশ্বাসের হাসি! আমি বুঝিলাম সে মনে মনে ইতোমধ্যেই আমাকে সম্পূর্ণরূপে তাহার করিয়া লইয়াছে।

বাহিরে আসিতেই মা বলিলেন—"তবে ওঁদের ব'লে পাঠাই, বিয়ে হবে না? অমন মেয়ে—ওর ভাগ্যে দেখ্‌ছি বুড়বরই লেখা আছে। তাঁর আর কি হবে, ওরে কপালের লেখন কি কেউ বদলাতে পারে!"

মা বড়ই মর্ম্মঘাতী শরক্ষেপ করিয়াছিলেন! বুকের মধ্যে হঠাৎ শোণিতরাশি এই মন্তব্যের আঘাত দিতেই যেন উথলিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে আজন্মের দৃঢ়সঙ্কল্প, সেই গভীর প্রেম, বিশ্বাস বিস্মৃত হইয়া নিতান্ত অপদার্থ কুটার মত ক্ষণিক আবেগ আবর্ত্তে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া বলিলাম,—"আচ্ছা মা, তোমার কথাই থাক্, ভদ্রলোককে যখন কথা দিয়েই ফেলেছ—"

মা এই কথায় যেন কি নিধি পাইলেন এমনি আহ্লাদে হাসিয়া আমার মাথায় হাত দিয়া অনেক আশীর্ব্বাদ করিলেন। ঐ কথা বলিয়াই কিন্তু আমার প্রাণের মধ্যে দপ্ করিয়া একটা আগুন জ্বলিয়া উঠিল। দ্রুতপদে ঘরে ফিরিয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িলাম। "মন্দা,—মন্দা দেখে যাও, তোমার প্রাণঢালা বিশ্বাসের, ভালবাসার পুরস্কার দেখে যাও!" অনুতপ্ত-হৃদয়ে উঠিয়া বসিলাম—"না মাকে বলিয়া আসি, যে বিবাহ করিব না"। কিন্তু মুহূর্ত্তে আবার বাতায়নবর্ত্তী

সেই মুখখানা নয়নপথে ভাসিয়া উঠিল। আবার সকল স্বপ্ন কোন অতলে তলাইয়া ফেলিলাম!

৫

তারপর কতবারই আবার মাকে বলিয়াছি যে, 'আমার অন্যায় হইয়াছে, ভুল হইয়াছে;—মা আমি বিবাহ করিতে পারিব না, আমায় তুমি ক্ষমা কর।' কিন্তু আর কি মা সে কথা কাণে তোলেন! তিনি আমার অপদার্থতা যে সেই ক্ষণেই দেখিয়া লইয়াছেন!

সেদিন ভোরবেলাও একবার ঐ সম্বন্ধে মা'র সহিত তর্ক করিয়া আসিয়া আবার আমি যখন বিছানায় ঢুকিলাম, তখন সবেমাত্র আকাশের পূর্ব্বদিক্ ঈষৎ লাল হইয়া আসিয়াছিল। শুকতারা সেই মাত্র ডুবিতে-ছিল, রাস্তায় তখনও গাড়ি ঘোড়া চলিতে আরম্ভ করে নাই, এমন কি রাস্তার আলো পর্য্যন্ত তখনও নিবান হয় নাই। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ভাবিতে ভাবিতে চোখে বুঝি একটু ঘুম-ঘুম আসিয়াছে, হঠাৎ একটি মৃদু কোমল স্পর্শে ঘুম ভাঙ্গিয়া চাহিয়া দেখিলাম, পাশে নন্দা দাঁড়াইয়া! প্রথমে নন্দাকে দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেও পরমুহূর্ত্তে গভীর-আনন্দে তাহার হাত ধরিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"নন্দা তুমি কখন এলে?" সে আমার পাশে বিছানার উপর বসিয়া বলিল, "এই এখনি আস্‌ছি। তুমি হয়তো হঠাৎ আমার আসা দেখে আশ্চর্য্য হচ্চো, কিন্তু আমি কাল যে খপর পেলুম, তাতে না এসে আর কিছুতেই সেখানে থাক্‌তে পারলাম না।"

আমার আর মুখ তুলিবার ক্ষমতা রহিল না। 'খবর'টা যে কি,

তা তো আমার জানা আছে।" অনেকক্ষণ পরে অতি কষ্টে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার মা কেমন আছেন মন্দা ?"

"মা আর কেমন আছেন। এই আশ্চর্য্য খবরটা পেয়ে সেই যে মূর্চ্ছা গেলেন, কিছুতেই আর তাঁর জ্ঞান হয় না। সেই থেকে তিনি একেবারে যেন অবসন্ন হ'য়ে পড়েছেন। সে রোগী ফেলে কেউ কি আসে,—তবে আমার নাকি নিতান্তই দায়; প্রাণের দায়ের চেয়েও বেশী দায়,—তাই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হ'য়েই ছুটে আসা! তা আজই আমি আবার ফিরে যাব।"

আমার অপরাধের ভারে ভারাক্রান্ত দৃষ্টি মুহূর্ত্তে নত হইয়া পড়িল। উৎসুকনেত্রে সে আমার দিকে চাহিয়াছিল। তাহার দৃষ্টির সহিত নিজের দৃষ্টি সম্মিলিত করিতে আজ আমার ত এতটুকুও সাহস নাই। কেমন করিয়া তাহার পানে চোখ তুলিয়া চাহিব!

আমায় নির্ব্বাক্ দেখিয়া মন্দা আবার বলিল, "তবে কি যে গুজব উঠেছে তা সত্য! না, না চুপ ক'রে থেকে মিথ্যে আমায় আর দগ্ধ ক'রো না! সত্যি মিথ্যে যাই হোক্ আমায় একটা কিছু বলো।" বলিতে বলিতে সে যেন অধীর হইয়া উঠিল।

আমি তবুও উত্তর দিতে পারিলাম না। বলিবার আমার আছেই বা কি যে বলিব?

মন্দাকিনী তখনও আধ অবিশ্বাসে বলিতেছে, "তুমি রাগ ক'রো না,—আমি একথা একটুও বিশ্বাস করি না। কেবল মা'র কথায় ছুটে এসেছি। তাই বুঝি তুমি রাগ ক'রে কথা কইছো না? কিন্তু লোকে কি অন্যায় রটনাই করে! তারা কি একটুও ভেবে

দেখে না যে তাদের এই নিষ্ঠুর উপহাস কারু বুকে মর্ম্মান্তিক ছুরির আঘাত করতে পারে!”

আমি আর থাকিতে পারিলাম না, কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, “না না মন্দা আমায় বিশ্বাস করিও না। আমি সত্য সত্যই চৌর, বিশ্বাসঘাতক!”

অকস্মাৎ অতর্কিত আক্রমণে আক্রান্ত ব্যক্তি হত্যাকারীর দিকে যেরূপ দৃষ্টিতে চাহে, তেমনি করিয়া সে আমার দিকে এক মুহূর্ত্ত চাহিয়াই যন্ত্রণার্ত্ত ব্যাকুল-কণ্ঠে কহিল,—“ব’লো না, ব’লো না—আমি বুঝেছি;—আমি বুঝেছি, আমি আর কিছু শুনতে পারবো না গো,—আমায় আর কিছু ব’লো না,”—বলিতে বলিতে সে পাগলের মত ছুটিয়া তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এই আকস্মিক বিপ্লবে আমিও কিছুক্ষণের জন্য শক্তিহীন হইয়া গিয়াছিলাম। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে হৃতশক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া তাড়াতাড়ি আমিও তাহার অনুসরণে উঠিয়া গেলাম। কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। একবার সন্দেহ হইল, হয়তো এতক্ষণ আমি স্বপ্নই বা দেখিতেছিলাম! কিন্তু না স্বপ্ন তো নহে,—সত্যই যে পাশের বাড়ীতে রসনচৌকিতে সাহানা রাগিণী বাজিতেছে! মা পাতকো’তলায় স্নান করিতেছিলেন, আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

“কে এসেছিল রে,—তোর ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটে চ’লে গেল?”

আকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—“কোথায় গেল মা! কোথায় গেল?”

“তা তো জানিনে, বাইরের দিকেই তো যেতে দেখ্‌লুম, আর

একটা গাড়ীরও যেন শব্দ হ'ল। যেন বৌমার মতন ধরণটা মনে হ'লো, কে' বল্ দেখি?"

বলিবার সময় ছিল না। আমি উন্মাদের মত রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিলাম। "মন্দা, মন্দা!" কিন্তু কোথাও কেহ ছিল না। গলিটা তখনও প্রায় জনশূন্য, অদূরে বড় রাস্তায় গাড়িঘোড়া, লোক চলাচল করিতেছিল। আমি এক বস্ত্রে খালিপায়ে তাহাদের মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিলাম।

তখন সবেমাত্র ট্রেণ চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। মন্দার পিত্রালয়ে যাইতে হইলে ট্রেণেই যাওয়া সুবিধা। কিন্তু তখনকার দিনে সহজে পল্লিবাসিরা সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব-দানবীয় শক্তিরূপী আগন্তুকের কাছ ঘেঁসিতে বড়একটাই সাহসী হইত না। মন্দার নৌকাপথে যাওয়াই সম্ভব ভাবিয়া, ঘাটে ঘাটে সন্ধান লইতে ছুটিয়া বেড়াইলাম। কিন্তু সেই অসংখ্য নৌকাশ্রেণীর মধ্যে কোন্‌খানি তাহাকে বহন করিয়া গিয়াছে, ক আমাকে তাহার সন্ধান দিতে পারে? ভাবিলাম, একখানা নৌকা ভাড়া করিয়া আমিও সেই পথে ছুটিয়া যাই। আবার আর একটা সম্ভাবনার কথা মনে উদয় হওয়াতে তাহা নিবৃত্ত হইলাম। জানিতাম, ভবানীপুরে মন্দার এক বিমাতার পিত্রালয়। কালী-দর্শনে আসিয়া একবার তাহারা এই বাড়ীতে উঠিয়া ছিল। একটা গাড়ি লইয়া সেই পথে ছুটিয়া গেলাম;—কিন্তু সেখানেও সে নাই।

সারাদিন ধরিয়া পথে পথে ছুটিয়া বেড়াইলাম। যেখানে তাহার থাকার সামান্য একটু সম্ভাবনা বোধ হইল, সেইখানেই অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু কোথায় মন্দা! পৃথিবীর হৃদয়হীন প্রবঞ্চনায়

মধ্যে কোন্‌খানে লুকাইয়াছে,—কোন্ লক্ষ্য ধরিয়া কোন্ অনির্দ্দেশ্য পথে চলিয়া গিয়াছে, কে তাহা বলিয়া দিতে পারে?

বৈকালে আকাশ ভরা মেঘ করিয়া দেখিতে দেখিতে ভারি একটা ঝড় উঠিল। অনাবৃত মস্তকের উপর ঝড় বৃষ্টির ঝাপ্‌টায় তখন যেন আমার হুঁস হইল, যে, আজ আরও একটা কর্ত্তব্যের ভার আমার মাথার উপর চাপান রহিয়াছে;—দেখা দরকার এতক্ষণ সেখানেই বা কি হইল!

নগ্নপদে অনাবৃত মস্তকে অর্দ্ধোন্মাদের মত ছুটিয়া দেড়প্রহর রাত্রে হীরালালবাবুর বাটী উপস্থিত হইলাম। তখন খুব জোরে বৃষ্টি পড়িতেছে; বাতাসের আক্রোশ তখনও ভাল করিয়া মিটে নাই; তখনও প্রভঞ্জন থাকিয়া থাকিয়া বৃষ্টিধারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়া ক্রোধে বিরাট হুঙ্কার ছাড়িতেছিলেন। বাড়ীতেও এদিকে মহা হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছে। বাজনার সাড়া নাই, আলোগুলা হয়তো জ্বালানই হয় নাই, নয় তো নিবিয়া গিয়াছে। চারিদিকের গোলমাল ও হায় হায় শব্দে বুঝিলাম, আমিই ইহার কারণ! সম্মুখেই কে একজন ভৃত্যদের প্রতি কি আদেশ প্রচার করিতেছিল,—আমি তাহাকে ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"মশাই, বল্‌তে পারেন, বিয়ে কি হ'য়ে গেছে?" সে ব্যক্তি আমার স্বরেই বোধ করি চমকিয়া আমার দিকে ফিরিয়া কহিল, "কে? বিপিন বাবু না?"

চিনিলাম ইনি কর্ত্তার বড়ছেলে ননীবাবু। ননী ডাকিল, "বাবা!"

তারপর আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই আমার হাত ধরিয়া এক প্রকার টানিয়াই ভিতরে লইয়া চলিল। পথের মধ্যেই গৃহস্বামীর সহিত

সাক্ষাৎ ঘটিবে তিনি গভীর আনন্দে যেন আকাশের চাঁদ পাইয়াছেন এমনি ভাবে বলিয়া উঠিলেন—

"তুমি এসেছ! আঃ আমি বাঁচ্লুম। আর একটু হ'লেই আমার সর্ব্বনাশ হচ্ছিল! এসো এসো!"

আমি সদৃঢ়ভাবে বলিলাম,—"এখনও সময় আছে আপনি অন্য পাত্র সন্ধান করুন, আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করতে পারবো না।"

"কি! তুমি পারবে না? জুয়াচোর, ছোটলোক, এমনি ক'রে ভদ্রলোকের জাত নষ্ট করা! জানো, তোমায় এখনি পুলিশ সোপর্দ্দ করবো—"

আমি ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করিলাম,—"আমার কি দোষ? আপনি একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে অনর্থক আমার ঘাড়ে এই দায় চাপাতে ব'সেছেন।—আমাকে পূর্ব্বে কি ঘুণাক্ষরেও এ সম্বন্ধে কিছু জানানো হ'য়েছিল? জুয়াচুরি ধরতে গেলে—আমিই বরং ঐ কথা বল্লেও বল্তে পারি।"

হীরালালবাবু একেবারেই নরম হইয়া পড়িলেন, কুণ্ঠিত বচনে বলিলেন, "আচ্ছা তুমি আমার সঙ্গে এসো; আমার অবস্থা দেখেও যদি তোমার দয়া না হয়, তা'হ'লে যা ইচ্ছা হবে তখন না হয় ক'রো।"

এই বলিয়া আমাকে লইয়া একটা ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঘরের আসবাবপত্র দেখিয়াই বুঝিলাম যে, সেটা সম্প্রদান-গৃহ। সেই ঘরে শালগ্রাম শিলা সম্মুখে লইয়া এক সৌম্যমূর্ত্তি প্রৌঢ় পুরোহিতের পার্শ্বে রক্তবর্ণের বারাণসী চেলী পরিয়া ষাট কি তাহার

চেয়েও দুই এক বৎসরের অধিক বয়স্ক এক ব্যক্তি বরের আসনে বসিয়া আছে। তাহার নরকঙ্কালের মত জীর্ণ বক্ষপঞ্জরের উপর এক ছড়া খুব মোটা ফুটন্ত মল্লিকার গোড়ে মালা দুলিতেছিল। আমি দেখিয়াই শিহরিয়া দুই পা পিছাইয়া গেলাম। হীরালাল বাবু অন্যদিকের দ্বার খুলিয়া আমায় ভিতরে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন, কলের পুতুলের মতই যেন তাঁহার সে আজ্ঞা প্রতিপালন করিলাম। দেখিলাম,—সেই রকমই আর একখানা লালরংএর স্বর্ণখচিত চেলীর সাড়ীপরা কনে পিঁড়ির উপরে বসিয়া আছে; তাহার আশে পাশে আরও দুই চারি জন পুরমহিলা তাহাকে ঘেরিয়া অস্ফুট বিলাপবাক্য বলিতেছিল,—"মাগো, আমাদের এমন সোণার হিরণের ভাগ্যে কি শেষে এই লেখা ছিল! তার চেয়ে কেন সে জন্ম আইবড় রইল না! বিধির এ কেমন ধারা বিধি!"

হীরালালবাবু কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "মা! হিরণ! আমায় অভিসম্পাত করিস্ নে মা! তোকে বাধ্য হ'য়েই আমায় রামখুড়োর হাতে দিতে হ'লো। ইনি তো কিছুতেই বিয়ে ক'রতে রাজী হলেন না। আর তো স্ব-ঘর পাত্র এরাত্রে কোথাও খুঁজেও পেলাম না, আমি না, আর কি করবো বল্?"

হিরণ্ময়ী মুখ তুলিয়া করুণনেত্রে বাপের দিকে চাহিল, দেখিলাম চন্দন চিত্র ভাসাইয়া তাহার আরক্ত কপোল বহিয়া অজস্র জলধারা অঝোরে ঝরিয়া পড়িতেছে। এইসময় ঘরের মধ্যের একটা স্ফুটতর বিলাপ কাতরোক্তি ঢাকিয়া ফেলিয়া একজন রমণী উচ্চকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন, "ওগো তোরা আমার হিরণকে এর চেয়ে শ্মশানঘাটে বিসর্জ্জন দিয়ে আয়গো, এমন ক'রে জীয়ন্তে ওকে

দগ্ধ করিস্‌নে। ও আমার যে কিছু জানে না, কোন দোষে যে ও আমার দোষী নয়।"

হীরালালবাবু অশ্রুরুদ্ধ কাতরনেত্রে আমার দিকে চাহিলেন।

আমি আতঙ্কে শিহরিয়া আর্ত্তভাবে বলিয়া ফেলিলাম, "আমি সম্মত, আমি বিয়ে কর্‌তে সম্মত!"

কন্যাকর্ত্তা সাগ্রহে আমায় আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "তবে এসো বাবা, আর সময় নাই।"

প্রত্যূষে কাহারও কোন আপত্তি না মানিয়া বিবাহের কাপড় বদলাইয়া ফেলিয়া ষ্টেশনে গেলাম। হুগলী পৌঁছাইয়া নৌকাযোগে হালিসহরে যাইব এইরূপ ইচ্ছা ছিল। ঘাটে অত্যন্ত গোলমাল ও জনতা দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসেচ্ছু হইয়া নিকটে গেলাম। শুনিলাম, গত কল্য একটি স্ত্রীলোক ও একজন বৃদ্ধ-ব্যক্তি বৈকালে একখানি নৌকা করিয়া গঙ্গাপার হইতেছিল, সেই সময় অকস্মাৎ ঝড় উঠিয়া তাহাদের নৌকা ডুবি হইয়া গিয়াছে। একজনের মৃতদেহ আজ পাওয়া গিয়াছে, অন্যের এখন পাওয়া যায় নাই। মুহূর্ত্তে আমার বক্ষের মধ্যে চলন্ত রক্তস্রোত যেন জমাট বাঁধিয়া গেল। গভীর উৎকণ্ঠাকে কোন মতে রুদ্ধ রাখিয়া যেখানে মৃতদেহ ঘেরিয়া সহস্র লোক জমা হইয়াছিল, সেখানে গেলাম।—গিয়া যাহা দেখিলাম, শত বজ্রাঘাতের চেয়েও তাহা বুঝি অসহ্য! সেই স্পন্দহীন, প্রাণহীন কর্দ্দমলুণ্ঠিত পরিত্যক্ত দেহ আমারই অভাগিনী পত্নী মন্দার! সে মুখে শান্তির নিবিড় ছায়াতল হইতে যেন উপহাসের মৃদুহাসি ফুটিয়া উঠিয়া আমার দিকে চাহিয়া তখনও সগর্ব্বে বলিতেছিল,—

"আমি 'সহিব না' বলিয়াছিলাম, দেখো দেবতাও আমার সে

প্রতিজ্ঞাপূর্ণ করিতে সহায় হইয়াছেন। আর তুমি? অবিশ্বাসী! তোমার সে সব মিথ্যা প্রতিজ্ঞা এখন কোথায় ভাসিয়া গেল!" সমস্ত পৃথিবী তখন আমার চোখে পূর্ণবেগে ঘুরিতেছে। নিজের অক্ষমণীয় অপরাধের ভারে তাহার সেই মৃতমুখের দিকে চাহিতেও যেন আমার মনে একতিলও সাহস ছিল না। সে জীবিত থাকিলে হয়তো সবটাকেই ঠিক আমার অপরাধ বলিয়া ধরিতাম না, কিন্তু এখন যেন কোথাও আর ইহার ক্ষমা খুঁজিয়া পাইলাম না। সমস্ত-জীবনটাকে কলঙ্কভারে কালো করিয়া দিয়া সে চিরদিনের মতই চলিয়া গিয়াছে!

মন্দা গেল;—আবর্ত্তমান কালের প্রবাহে পরে পুত্র কন্যা বধূ জামাতা পরিবৃতা হিরণ্ময়ীও তাঁহার সোণার সংসার পরিত্যাগ করিয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছেন। মন্দার শোক ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া মিলাইয়া আসিয়াছিল, হিরণের শোক ও স্মৃতি এখনও এই জীর্ণ পঞ্জরের স্তরে স্তরে কাঁটার মতন বিঁধিয়া রহিয়াছে।

আজ আবার কত দিন পরে অতীতের ধূলিজাল সরাইয়া একখানা পুরাতন পর্দা যেন এই একটিমাত্র স্নিগ্ধস্পর্শে খুলিয়া পড়িল। আজ আবার যেন মনের মধ্যে সেদিনকার শোক নৈরাশ্য এবং অনুতাপের চিত্র সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সেদিন যে হাহাকার বুকে বহিয়া অপরাধের কালিমালিপ্ত মুখে ডাকিয়াছিলাম—একি করিলে ভগবান! হিরণ্ময়ীকে আমায় কেন দেখাইলে? আজ এই শরতের হৈমপ্রভাতে মনে হইল নিয়তির পাশবদ্ধ ক্ষুদ্র জীব মাত্র আমরা—আমাদের এ ভাঙ্গাগড়ার মধ্যে কিছুই করিবার হাত নাই! এই পুত্র-পৌত্র পরিবৃত জীবন আমার প্রাপ্য এ জীবন আমাকে তাই সেদিন অমন করিয়া

বহুমূল্যে কিনিতে হইয়াছিল। তাহাতে বাধা দিবার আমারই বা সাধ্য কি?

যাহা হারাইয়াছিলাম, এবং যাহা পাইয়াছিলাম, তুলনায় লাভের দিকেই বোধ হয় পাল্লা ঝুঁকিবে, কিন্তু সেদিন সেই সঙ্গে সেই গঙ্গাগর্ভে যে অমূল্য বিশ্বস্তহৃদয় বিসর্জ্জন দিয়াছিলাম, সে জীবন যোড়া অনুতাপের স্মৃতি আজও বিস্মৃত হইতে পারি নাই, বুঝি এদেহে প্রাণবায়ু যতদিন বহিবে, ততদিনের মধ্যে কোন দিনই তাহা পারিব না।

দেবদাসী।

১

ত্রিণাবেলীর সুপ্রসিদ্ধ পিঙ্গলেশ্বর মন্দিরের বৃদ্ধ পুরোহিত আপ্পে চিদম্বরম্ যখন শিশু বিশোকার সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহার মুমূর্ষু জননীকে নিশ্চিন্ত চিত্তে মরিবার অবসর দিলেন, তখন হইতেই সকলে বুঝিয়াছিল যে, এ মন্দিরে একজন দেবদাসীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইল।

মন্দিরে পাঁচ জন দেবদাসী বাস করিত। ইহার মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা চম্পা শিশু বিশোকার লালনভার গ্রহণ করিলেন। শিশুর মুখে যখন প্রথম কথা ফুটিল, তখন সে চম্পার ক্রোড়ে বসিয়া ডাকিল, "মাম্-মা!" অমনি চমকিয়া দ্বিতীয়া দেবদাসী অচলা শিশুর মুখ চাপিয়া ধরিয়া মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "চুপ! চুপ! মা তোর আবার কে? মা তোর নাই!"

দেবদাসী দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গিতা। এ পৃথিবীর সহিত তাহার কোনরূপ সম্পর্ক পাতানো চলে না। সে কাহারও কন্যা নয়, বনিতা বা মাতা,—কিছুই সে নয়, শুধু সে—দেবদাসী, ইহাই তাহার একমাত্র পরিচয়।

ইহার পর হইতে যখনই শিশু না বুঝিয়া পালন-কর্ত্রীকে মাতৃ-সম্বোধন করিতে গিয়াছে, তখনই সে বাধা পাইয়াছে। জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মা বুলি সে ভুলিয়া গেল। সকলের কাছে শুনিয়া শিখিয়া সে-ও চম্পাকে 'বড় ঠাকুরাইন্' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল।

পাঁচজন দেবদাসী। দেব মন্দির-সংশ্লিষ্ট উদ্যানের প্রান্তে তাহারা বাস করে। লম্বা টানা দালানের ধারে ধারে পাঁচ জনের জন্য অনতি-বৃহৎ পাঁচটি কুঠরি। তাহার পাশেপাশে সে ধরণের আরও দুই-চারিটা ঘর খালি পড়িয়া ছিল। দেবদাসীর সংখ্যা সব সময় ঠিক এক রকমইতো থাকে না।

বিশোকার বয়স যখন আট বৎসর—তখন একদিন চম্পা তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, "আজ থেকে তুমিও আমাদের মত নিজের একটি আলাদা ঘর পাবে। এস, তোমায় তোমার ঘর দেখিয়ে আনি।" বালিকা কিছু না বলিয়া চম্পার অনুসরণ করিল।

অল্প বয়সে স্বাধীনতার প্রতি অন্তরের মধ্যে কেমন যেন একটা আত্যন্তিক টান থাকে। এই বয়সেই নিজের একটি স্বতন্ত্রঘর পাইবে শুনিয়া, বিশোকা তাই যথেষ্ট আনন্দ বোধ করিল। প্রথমে সে ঘরটিতে প্রবেশ করিয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিল। প্রথম দর্শনেই নবজাত সন্তানের প্রতি জননীর যেরূপ বাৎসল্য সঞ্চারিত হয়, যাহার আপনার বলিতে এ পৃথিবীতে কিছুই নাই, তাহার এই আপনার জিনিস গৃহটির প্রতিও তেমনই এক অভিনব আকর্ষণ সে অনুভব করিল। ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া চারি ধারে সে খানিক নড়িয়া ফিরিয়া বেড়াইল, আপনার ক্ষুদ্র শয্যাটির উপর একবার বসিল, জানালা দিয়া চিরপরিচিত উদ্যান-সীমানায় দৃঢ় প্রাচীর-বেষ্টনটিও একবার নূতন করিয়া দেখিয়া রহিল, তারপর ফিরিয়া দড়ির আলনায় ঝুলান নিজেরই ঘাঘরি আঙ্গিয়াকয়টি নাড়িয়া চাড়িয়া গুছাইতে লাগিল। তাহার মুখ দেখিয়া এমনই মনে হইতেছিল, যেন এক বৃহৎ সংসারের কর্ত্রীরূপে সে আজ তাহার নূতন গৃহস্থালীর মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কিন্তু এ আনন্দ নিতান্তই ক্ষণিক! যখন সে শুনিল, এই ঘরে রাত্রে তাহাকে একা শয়ন করিতে হইবে, তখনই তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। চম্পার ওড়না চাপিয়া সে কহিল, "আমি তোমার কাছে শোব।"

"না, ছিঃ, আব্দার ক'রো না। তোমায় তো আব্দার করতে নেই।"

"কেন ঠাকুরাইন্?"

"আস্ছে পূর্ণিমায় তুমি দেবদাসী হবে যে।"

এ কিছু নূতন কথা নয়। বাল্যাবধি চিরদিনই উঠিতে বসিতে এ কথা বিশোকা শুনিয়া আসিতেছে। ভবিষ্যৎ দেবদাসীকে অনর্থক হাসিতে নাই, দৌড়িয়া চলিতে নাই, আব্দার করিতে নাই, এক কথায় তাহার কিছুই করিতে নাই, শুধু দুইটি খাইতে হয়, আর নিজের দেহ মাজিয়া ঘষিয়া, চোখে কাজল টানিয়া, চরণে অলক্ত রাগ আঁকিয়া নৃত্য গীত শিক্ষা করিতে হয়। জ্ঞানোদয় হওয়া অবধি এ কথা সে অন্ততঃ সহস্র বার শুনিয়া আসিয়াছে,—শুনিয়া শুনিয়া সেই ভাবেই কাজ করিয়াও আসিতেছে,—তবুও এ বিস্মৃতি! তবে এই আগামী পূর্ণিমার কথাটাই সে এবার শুধু যা' নূতন শুনিল। কিন্তু আজিকার এ উপদেশ গ্রহণ করা তাহার মত এতটুকু একটি বালিকার পক্ষে বড় সুবিধার নহে। বাহিরে কৃষ্ণপক্ষের গাঢ় অন্ধকারে চারি ধার তখন ভরিয়া গিয়াছে,—সকলের শেষের ঘরটায় সে সারা-রাত্রি একা থাকিবে,—এই কথা মনে করিতেই তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল! একা থাকিবে? না, না সে তা' পারিবে না। সাহস করিয়া সে বলিয়া ফেলিল, "ভয় করবে যে, ঠাকুরাইন্? আমার যে

বড্ড ভয় করবে!” বলিতে বলিতে সে তাঁহার কাছে আরও একটুখানি ঘেঁসিয়া আসিল। ভয়! সে কথাটা মনে পড়িলেই যে মানুষের প্রাণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠে!

দেবদাসী চম্পার মনে যে কোমলতা আদৌ ছিল না, এমন কথা ঠিক বলা যায় না। কিন্তু চিত্ত নির্ব্বিকার রাখাই দেবদাসীর কর্ত্তব্য! সেই কর্ত্তব্যের বিরুদ্ধাচরণ তো আর তিনিও করিতে পারেন না। কাজেই জোর করিয়া বালিকার ভয়-কাতর মিনতির পানে লক্ষ্য না করিয়াই তিনি গম্ভীর মুখে কহিলেন, “ভয় কি! দেবদাসীর প্রাণে ভয় থাকতে দিতে নেই। যাও, কোনদিকে না চেয়ে নিজের ঘরে চ'লে যাও, দোর বন্ধ ক'রে শুয়ে পড়ো গে। এ ক'দিন চিত্ত নির্ব্বিকার করতে অভ্যাস ক'রে নাও, পূর্ণিমার আর তো দেরী নেই।” অনিচ্ছুক বালিকার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে তিনি ভিতরে লইয়া গেলেন,—ঘরের ভিতরে তাহাকে রাখিয়া ফিরিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। মন তাঁহার এ কঠোরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া কাঁদিতে চাহিল, বিশোকাকে ফিরাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল,—আহা, ভয়-চকিতা বালিকা!—কিন্তু না,—উভয়েরই ইহাতে ব্রতভঙ্গ-পাপ হইবে! সে পাপ বহন করিবে কে? সংসার-জীবের প্রতি দেবদাসীর মায়া শোভা পায় না।

কতরাত্রি পর্য্যন্ত চক্ষে নিদ্রা আসিল না। মন কেবলি পাশের দিকে বিছানা হাতড়াইয়া কাঁদিতে চাহে, কর্ণও উৎকণ্ঠিত হইয়া বাহিরের কাল্পনিক শব্দ শুনিতে থাকে। একসময় বাহিরের দিক হইতে যেন একটা ভয়ার্ত্ত কাতরোক্তি, পরক্ষণে আবার যেন কাহার দ্রুত পদধ্বনি, নীরব রজনীর ঘন অন্ধকার চিরিয়া শূন্যে মিশিয়া গেল।

রুদ্ধ দ্বারের অন্তরালে শয্যায় পড়িয়া বিনিদ্রা চম্পা ছট্‌ফট্‌ করিয়া শু
প্রহর গণিল, তথাপি নিয়মভঙ্গ হইতে দিল না।

ওখানে নির্জ্জন গৃহে আড়ষ্ট বালিকা পেচকের কর্কশ শব্দে শিহ
রিয়া দুই হস্তে কর্ণ আচ্ছাদন করিল। অলক্ষ্যে তাহার রুদ্ধ কণ্ঠ
ফাটিয়া সভয় কাতরোক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, "মাগো!"

হায়, কোথায় কে! কোথায় তাহার মা! মা বলিয়া ডাকিয়া
কোন অনির্দ্দেশ্য সুদূর লোকে তাহার শরীরিণী অথবা অশরীরী মাতৃ
বক্ষে সে কোন অজ্ঞাত আকুলতা জাগাইয়া তুলিতে পারিল কিনা, কে
জানে! কিন্তু এ জগতের কাহাকেও সে এই মধুময় 'মাতৃ' সম্বোধনে
টলাইয়া নিজের পানে টানিতে পারিল না। ভাষাহীন অব্যক্ত কাতর
ক্রন্দনে তাহার সারা প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিল; তথাপি কেহ আসিল
না। উৎকণ্ঠিত বক্ষে কোনমতে সে রজনী যাপন করিল।

ভোরের আকাশ তখনও নির্ম্মল হয় নাই, শুকতারা ঈষৎ ম্লা
চোখে চাহিয়াছিল; পূর্ব্বদিক্ একটা ভাবী সৌভাগ্যের সূচনা
অরুণ-রক্ত বর্ণে রাঙ্গিয়া উঠিতেছে—সহসা বাহিরে মনুষ্য-পদধ্বনি শ্রু
হইল। এতক্ষণে সেই পরিচিত ধ্বনিটুকু শুনিয়া যেন মৃত দেহে জীব
লাভের মতই তাহার অর্দ্ধলুপ্ত সংজ্ঞা আবার ফিরিয়া আসিল। ত
আবার সে মানুষের মুখ দেখিতে পাইবে! তবে সে বাঁচিয়া আছে,-
মরে নাই!

বাহিরে আসিতেই সে বুঝিল, সতর্ক দ্রুত ত্রস্তপদে কে
চলিয়া গেল। বিদ্যুতের মতই ক্ষিপ্র সে গতি!—কেও? বিশো
চিনিল, ডাকিল, "মা,—বড় ঠাকুরাইন্!" ঠাকুরাইন্ ফিরিলেন·
মনের কোণে যদি কোথাও এক ফোঁটা একটু মানবীয় দুর্ব্বলতা গো

লুকাইয়া থাকে, তাহাকে লোক-লোচনের দৃষ্টিপথে প্রকাশ করা কেন?

পরীক্ষার কয়টা দিন কাটিয়া গেলে যথাসময়ে সাড়ম্বর সমারোহে অষ্টমবর্ষীয়া বিশোকা ষষ্ঠ দেবদাসীর স্থান অধিকার করিল। সে দিন সে কি আনন্দ! নূতন অলঙ্কার-বস্ত্র, ও পুষ্পমাল্যে ভূষিতা বালিকা বিগ্রহ-কণ্ঠে মাল্য পরাইয়া আপনাকে দেব-চরণে উৎসর্গিতা করিল। পার্থিব জগতের সকল সুখ দুঃখে জলাঞ্জলি দিয়া অপার্থিব জীবনের মধ্যে সে আপনাকে বিকাইয়া দিল। ক্ষুদ্রা মানবী আপনাকে দেবীত্বে অভিষিক্তা করিয়া এক বিপুল গৌরবে নিজেকে বিমণ্ডিতা ও আপনার জন্ম সার্থক বোধ করিল।

২

সুদীর্ঘ পাঁচ বৎসরে সংসারে অনেক পরিবর্ত্তনই ঘটিয়াছিল। প্রধান পুরোহিত চিদম্বরম্ আপ্পে গতিশীল জগতের চক্রনেমির আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আবর্ত্তিত হইয়া কোন এক নূতন পথে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্থানে সদাশিব দেশপান্ডে এখন প্রধান আচার্য্য। চতুর্থী দেবদাসী রঙ্গিলা কঠিন রোগশয্যায় শায়িতা, অচলা, অপহৃতা এবং বালিকা বিশোকা এখন পূর্ণ ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে অতুল লাবণ্য-বিভূষিতা নবোদ্ভিন্ন-যৌবনা কিশোরী।

এখন নিজের ঘরে আর একা থাকিতে তাহার মনে কিছুমাত্র ভয় হয় না। শুভ্র শয্যাতলে সুন্দর তনু এলাইয়া দিয়া বিশ্রাম-সুখ-ভোগে দিনযাপন এবং সেই চারু-দেহ মার্জ্জিত শোভিত করিয়া তুলিতেই দিনের অধিকাংশ সময় তাহার কাটিয়া যায়। সন্ধ্যায় যখন সে হরিদ্রা,

গোলাপী বা নীল বর্ণের পেশোয়াজ, বিচিত্র আঙ্গিয়া ও ফিরোজী ওড়না পরিয়া ঠাকুরের নাট-মন্দিরে নাচিতে যায়, তখন দর্শকের দল বিপুল বিস্ময়ে, প্রশংসমান নেত্রে তাহার পানেই চাহিয়া থাকে! চাহিয়া চাহিয়া তাহারা যেন বিহ্বল উন্মত্ত হইয়া উঠে। তাহার সঙ্গীত, এস্‌রাজ-বীণায় তাহার মধুর আলাপ,—সেই অপূর্ব্ব নৃত্যলীলা সে সমস্তই যেন ইন্দ্রালয়ের নর্ত্তকীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তরঙ্গময়ী গিরি-তটিনীর ন্যায়ই তাহার গতিটুকু অত্যন্ত লঘু, তেমনই লীলা-চঞ্চল! দর্শকের মনে হয়, এ যেন বাস্তবিকই একটি বিদ্যুতের বিকাশ, তেমনি দাহশক্তিসম্পন্ন, আর তেমনই কি সুন্দর! সমগ্র ত্রিণাবেলী জুড়িয়া দেবদাসী কিশোরী বিশোকার লাবণ্য ও কৃতিত্বের খ্যাতি দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

প্রতিদিনই মন্দিরের নাট্যশালায় দর্শকের সংখ্যা বাড়িয়া উঠিতেছিল। বহু গণ্যমান্য ধনী, এমন কি স্বয়ং মহারাজাধিরাজও একদিন তাহার দর্শনে আসিয়া, সেই অবধি প্রত্যহই প্রায় দর্শকরূপে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন।

বিশোকা কিন্তু এ সবের কোনই খোঁজ রাখিত না। সারাদিন বিবিধ বিচিত্র বেশে নিজেকে সে সাজাইত, বিবিধ ছাঁদে কবরী রচনা করিত, নবীন সুরে তন্ত্রী আঁটিয়া নব-নব সঙ্গীত সাধনা করিত! সেই সারাদিনের সমস্ত শ্রম বিনিময়েও নিজের জন্য সে এতটুকু সুখাবেশের আকাঙ্ক্ষা রাখিত না। কাহারও প্রশংসা-বাণী তাহার কর্ণে প্রবেশ করিত না। সকল প্রাণ-মন, যাঁহার পরিতোষের জন্য সে উৎসর্গ করিয়াছে, তাঁহারই পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে শুধু চাহিয়া থাকিত!

অবশেষে যখন চারিদিকে দর্শকের দল হইতে প্রশংসার করতালি, পুষ্পমালা ও স্বর্ণরজত-বর্ষণের ঘটা পড়িয়া যাইত এবং অপর দেবদাসী-গণ সেই সকল সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিত, বেহালাবাদক সঘন বেগে ছড়ি টানিয়া বাদ্য-শেষের সূচনা প্রকাশ করিত, তখন স্পন্দিত বক্ষে সে কৃপাণি হইয়া বিগ্রহের পানে অনিমেষে চাহিত। আন্তরিক ব্যাকুলতায় তাহার সারা চিত্ত বিগ্রহ-চরণে তখন যেন লুটাইয়া পড়িত, —যেন সে বলিত, "এতটুকুও প্রসন্ন হইলে তো! ওগো আমার জীবন-দেবতা! দাসী তোমায় মুহূর্ত্তের জন্যও একটুখানি তৃপ্তি দিয়াছে কি ?" তারপর কোলাহল-হুড়াহুড়ির ভিতর দিয়া কোনদিকে লক্ষ্য মাত্র না করিয়া যথার্থ দেবলোক-চারিণীর মতই সে নিজ স্থানে ফিরিয়া যাইত। চৌদিকস্থ কৃপাপ্রার্থীর দল অশেষ-বিশেষ চেষ্টাতেও তাহার দৃষ্টি-আকর্ষণে সমর্থ না হইয়া অপমানে, অভিমানে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িত। রোষে ক্ষোভে তাহাদিগের চিত্তগুলা যেন গর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া বলিতে থাকিত,—'এতই কি অহঙ্কার! কাহাকেও একটু দৃক্‌পাত পর্য্যন্ত নাই!'

বাস্তবিকই যে বিশোকার মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড অহঙ্কার সগর্ব্বে ঊর্দ্ধে মাথা তুলিয়া না দাঁড়াইয়াছিল, তাহা নহে। মর্ত্ত্যচারী মানবের তুলনায় আপনাকে সে কোন সুদূর ঊর্দ্ধলোকের জীব বলিয়াই মনে করিত। সে জানিত, ইহারা মানুষ, কিন্তু সে—দেবী! দেবতা ভিন্ন এজগতের কাহারও সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। এ সংসারে কোন্‌খানে কি ভাবে কে চাহিয়া আছে, সে সংবাদে তাহার কি প্রয়োজন!

এমনই করিয়া দিন কাটিতেছিল। দিনের পর মাস, মাসের পর বৎসর আসিয়া ক্রমে আরও দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

ক্রীড়াশীল নদী-তরঙ্গের মতই কালস্রোত বহিয়া চলিয়াছে। সে অবিরাম স্রোত-ধারা কাহারও পানে চাহিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়ায় না! তট ভাঙিয়া, গ্রাম ভাসাইয়া, নিজের গতিপথকে নদী যেমন ঠিক রাখে, সময়ও তেমনই শিশুকে বালকত্ব, কিশোরকে যৌব' ও প্রৌঢ়কে বৃদ্ধত্ব দান করিয়া সম তালে নিজের পথ ধরিয়া বহিয়া যায়। তাহার স্পর্শে, কোথায় কোন্ তরুণ লতায় ফুল ধরিল, কোন্ জীর্ণ শাখা শুকাইল, এ সংবাদ লইবার জন্য তাহার গতি ফেরে না।

বসন্তের নব মুঞ্জরিত মাধবীর ন্যায় নূতন শোভা-সম্পদের মধ্যে বিশোকার দেহও অভিনব নিটোল মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছিল। নীল বসনে সাজিয়া সেদিন বসন্ত-সায়াহ্নে দেবারতির পর যখন সে নিজের গৃহে ফিরিতেছিল, তখন তাহার প্রাণের মধ্যে বসন্তের উতলা হাওয়ার মতই একটা অত্যন্ত এলোমেলো ভাবের বাতাসও সহসা যেন কোথা হইতে গুঞ্জরিয়া উঠিল। চারিদিকে তখন চাঁদের আলোয় ঢেউ লাগিয়াছে; যতদূর দেখা যায়, আকাশে কেবল আলোর মালা গাঁথা। দেব-মন্দিরের সুরভিজলে সিঞ্চিত পুষ্প-পরাগের স্নিগ্ধ গন্ধ বায়ুর অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। বিশোকার প্রাণের মধ্যে তখনও সেদিনকার সন্ধ্যার সুরের হাওয়া একটি মিষ্ট আবেশে সুখ-স্বপ্নের মতই ঘুরিয়া ফিরিতেছিল।—কিন্তু তাহার মাঝখানে আবার এ কি? গান যখন শেষ হইয়া গেল, তখন এক মুগ্ধ চিত্তের অর্দ্ধস্ফুট বাণী,—"সুন্দরি! এ সুর কেন অনন্ত হইল না!" অতি মৃদু-উচ্চারিত এ স্তুতিটুকু, তাহার উদ্দেশ্যে—কে পাঠাইল? সেই এক তরুণ নেত্রের সতৃষ্ণ দৃষ্টি, সে আ... ক্ষণই না তাহার পানে নিবদ্ধ ছিল! ভাষা যাহা প্রকাশ করিতে পারে না,

প্রকাশ করিতে গিয়া সরমে জড়াইয়া নীরব হয়, তাহার সে দৃষ্টিতে বুঝি সেই কথাই প্রকাশ পাইতেছিল!

বিশোকার সর্ব্ব শরীর সে নেত্রপাতে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তাহার সকল শিরার সহজ শোণিতপ্রবাহ সেই দৃষ্টির তাড়িত-আকর্ষণে ছুটিয়া উভয় গণ্ড বাহিয়া বাহির হইতে চাহিয়াছিল! সে তাহার সরল দৃষ্টি, আজ দর্শকের মুখে তাই তেমন নিঃশঙ্কভাবে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই, শুধু সলজ্জসঙ্কোচে নেত্র নত করিয়াছিল।

ঘরে ফিরিয়া সে বসন ত্যাগ করিল না, শয্যা-প্রান্তে বসিয়া পড়িয়া নীরবে কত কথাই ভাবিতে লাগিল।—দেশের অধিপতি কেন আজ এমন করিয়া তাহার পানে চাহিতেছিলেন?—কণ্ঠে তাঁহার আজ কেন সে সুর!

রাত্রি বাড়িয়া চলিল। গাছের আড়ালে জ্যোৎস্না-জাল ক্রমে ক্ষীণ হইল। চাঁদ ম্লান হইয়া আসিল। নিরালা পথে গ্রামের কুকুর ডাকিয়া ডাকিয়া থামিয়া গেল। এই অভিনব সংশয় হইতে আপনার অনভিজ্ঞ সুকুমার হৃদয়কে মুক্ত করিতে না পারিয়া বিশোকা আস্তরণতলে শ্রান্ত দেহ অলসভাবে বিছাইয়া দিল। চক্ষে তাহার ঘুম আসিল। স্বপ্নে আবার সেই সুর বাস্তবের মতই সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়া কাণের কাছে মৃদু গুঞ্জনে কুহরিয়া গেল, "সুন্দরি, এ সুর কেন অনন্ত হইল না!"

প্রভাতে চক্ষু মেলিতে সে দেখিল,—একি দৃশ্য! এ আলো, এ কিরণ, এ কি কোন নূতন লোকের? নূতন সূর্য্যের? বাহিরে মধুর বাতাস যেন অযুত পাখীর গানে ভরিয়া গিয়াছে! ফুলের বর্ণে-গন্ধে এ কি নব নব মাধুর্য্য! ধরণী-বক্ষ কি মনোমোহন শ্যামলতায় আজ ভরিয়া

উঠিয়াছে!—একি নূতন?—না, এত দিন সেই অন্ধ ছিল,—আজ প্রথম তাহার দৃষ্টি খুলিয়াছে?

আজ সবার মাঝে, সকল কাজে, সেই একটি চাহনি, সেই একটি সুরই অখণ্ড বিচিত্র তালে-ছন্দে বাজিয়া ফিরিতেছিল,—এবং তাহা সুন্দরীকে তাহার অজ্ঞাতসারেও যেন স্মৃতির সরমে রাঙাইয়া তুলিত ছিল।

প্রধান পুরোহিত এতদিন শুধু লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছেন, আজ তাঁহার পর্য্যবেক্ষণ সার্থক হইয়াছে। আজ তিনি দেখিয়াছেন, তরুণ পিপাসু লোচনের মুগ্ধ দৃষ্টি কিশোরীর প্রতি তেমনই আবদ্ধ, কিন্তু সে দৃষ্টিকে কিশোরী আজ অবহেলা করিতে পারিতেছে না, সে দৃষ্টির সম্মোহনে,—সেও বুঝি আজ মুগ্ধ! রাজ-নেত্রেও সরলতার সে স্বচ্ছতা আর নাই, সে দৃষ্টিও যেন কি এক সংশয়ভারে ক্ষণ-কম্পিত! কিশোরীরও কণ্ঠে আজ বিহঙ্গীর আত্ম-নিবেদনের সে আপনাভোলা সুর আর নাই, আপনাকে ঢাকিবার একটা প্রবল চেষ্টা সে সুরে বিদ্যমান ছিল। মৃদু হাসিয়া সদাশিব ভাবিলেন, দেবপ্রসাধনের স্থান মানবচিত্তের দুরাকাঙ্ক্ষায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তাই এই কৃত্রিমতার সৃষ্টি!

সেদিন সভা ভাঙ্গিবামাত্র বিশোকা নাটমন্দির ত্যাগ করিল, দেবতার দিকেও আজ ভাল করিয়া সে চাহিতে পারিল না। কি যেন এক গোপন অপরাধের সঙ্কোচে নিজের কাছেই সে কিছু না জানিয়া না বুঝিয়াও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া-ছিল।—অননুভূত-পূর্ব্ব কি এক গভীর স্পন্দনে তাহার বুকখানা মুহুর্মুহুঃ আজ কাঁপিয়া উঠিতেছে। মনে হইতেছে, জীবনে তাহার কি একটা প্রকাণ্ড ভুল হইয়া গিয়াছিল, আজ প্রথম সেই ভুলটুকু যেন ধরা পড়িয়াছে।

ত দিনে সে যেন একটা আলো দেখিতে পাইয়াছে, কিন্তু তাহার খার ভিতর হইতেও যেন একটা অস্পষ্ট অন্ধকার, একটা াতঙ্কের ছায়াও সেই সঙ্গে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

সেদিনও সেই জ্যোৎস্না-স্বর্ণখচিত ওড়্‌নায় অঙ্গ ঢাকিয়া রজতাম্বরা নশীথিনী বাসক-শয়নে চলিয়াছে, নীলচন্দ্রাতপতলে দাঁড়াইয়া প্রজ্বলিত ীপ হস্তে পূর্ণিমার চন্দ্র মর্ত্ত্য পানে চাহিয়াছিল,—এমন সময়, অতি নকটে মৃদু স্বরে কে ডাকিল, "সুন্দরি!"

চমকিয়া বিশোকা ফিরিল। তাহার সর্ব্বশরীর বেতসের লতার ায় কম্পিত হইয়া উঠিল। সম্মুখে স্বয়ং রাজাধিরাজ উৎপলাদিত্য!

রাজা একপদ অগ্রসর হইলেন, কহিলেন, "ভয় নাই,—তোমাকে মামি শুধু এই কথাটি বলিতে আসিয়াছি,—তুমি স্বর্গের পবিত্র ফুল,— াই ভয় হয়, পৃথিবীর পাপ-পঙ্কে পাছে কোন্ দিন মলিন, কলুষিত ও। যদি অভয় পাই ত একটি কথা নিবেদন করি—"

বিশোকা যেন তড়িতাহত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার শরীরে বুঝি খন কিছুমাত্র চেতনা ছিল না। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সে শুধু চাহিয়া িল, *প্রশ্ন বুঝিল না, উত্তরও সে খুঁজিল না। শুধু একটা তীব্র* নন্দে সে যেন কেমন একপ্রকার বিহ্বলপ্রায় হইয়া পড়িল। সের এ আনন্দ,—তাহাও সে বুঝি বুঝিল না।

নৃপতি আর একপদ অগ্রসর হইলেন,—কহিলেন "এ দেবমন্দির ্যভূমি সন্দেহ নাই,—কিন্তু দেবদাসীর পক্ষে তাহার জীবনটাকে পবিত্র খা একান্তই সুকঠিন। দেবদাসী নামেই শুধু দেবদাসী, প্রকৃতপক্ষে হারা মন্দিরেরই পুরোহিত যাজকগণের সেবিকা।—শিহরিতেছ? মি নিতান্ত সরলা, তাই আজও যে জীবনের মাঝখানে তুমি বর্দ্ধিত,

সে জীবন চিনিতে পার নাই, তাই নিজের অবস্থাও অনুভব করিতে পারিতেছ না। কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ সত্য! আর তোমার দুঃখের দিনও এইবার আগতপ্রায়। যদি এমনই পবিত্র, নির্ম্মল থাকিতে চাও, তবে অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ কর।”

বিশোকা এখনও কিছু বুঝিল না, কিন্তু একটা অজানা বিপদাশঙ্কায় তাহার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ‘তাহার বিপদের দিন আসন্ন?’—কি বিপদ্! দেবদাসীর বিপদ্! মহারাজ আজ এ’ কি নূতন কথা বলিতেছেন! ‘পুরোহিতের সেবিকা? নামে শুধু দেবদাসী?’ কম্পিত দৃষ্টি তুলিয়া সে যেন কি একটু বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু মাত্র একটা অস্ফুট মর্ম্মরে তাহার নিবেদনটুকু ভাষা হারাইয়া-থামিয়া গেল। কি বলা যাইতে পারে, তাহাও সে আর ভাবিয়া পাইল না।

রাজা তাহার অন্তরের ভাব যেন বুঝিলেন। বুঝিয়া চারিদিকে চাহিয়া আর একটু নিকটবর্ত্তী হইলেন, বলিলেন, “বিশোকা, এ বুকের মধ্যে যাহা আছে, তাহা চিরদিন এমনই অব্যক্তই থাক। দেব-নির্ম্মাল্য মানুষ শুধু মস্তকে ধারণ করবারই অধিকারী, আর কিছুরই নয়। সেই অধিকারই শুধু আমায় তুমি দাও। এমন কোন নিরাপদ স্থানে তোমায় রক্ষা করি, যেখানে—এমন কি আমি নিজেও তোমায় আর কখনও না দেখিতে পাই। আমার মা কাশীবাসিনী, সেখানে তাঁর কাছে তুমি যাবে কি?”

বিশোকা নীরবে নত নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন উত্তরই সে দিল না।

রাজা আবার কহিলেন, “ত্বরা নাই,—না হয়, কিছু সময় নাও, কাল এইখানে আবার সাক্ষাৎ হইবে। যথার্থ কথা বলিতে কি, নিজের

উপরও আমার তেমন বিশ্বাস নাই। কি জানি, মনে কখন কি ভাব আসিয়া পড়ে—দেবতার ধনে মানুষের লোভ হয় কেন? সে লোভ শুধু ধ্বংসই আনে। কিন্তু হায়, এখানে দেবতাই বা কোথায়? তুমি পুরোহিতের,—সে তোমার প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে। তাহার হাত হইতে তোমায় রক্ষা করিতে পারি, এমন ক্ষমতা আমার নাই,—কাহারও নাই। তাই অনেক ভাবিয়া শেষে এই উপায়টাই আমি স্থির করিয়াছি,—তোমায় নিরাপদ করিয়া তোমার *সহিত পার্থিব জগতের সমস্ত বন্ধনই আমি ছিন্ন করিব, নহিলে বুঝি তা পারিব না*—”

কে যেন সরিয়া গেল। একটা ছায়া!

“আজ তবে বিদায় বিশোকা—” চকিতে উৎপলাদিত্যের দীর্ঘ মূর্ত্তি অন্ধকার স্তম্ভান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। সকল শরীরে তাড়িতাঘাত, মনের মধ্যে সুখ-দুঃখ-ভয়ের মিশ্রণে একটা বিপুল আলোড়নের বেগ বালিকাকে একেবারে স্তম্ভিত করিয়া তুলিল। মধ্যাহ্ন আকাশে পূর্ণগ্রাসী-সূর্য্য-গ্রহণের মতই,—বিপুল তীব্র আলোর মাঝখানে,—অকস্মাৎ আজ এ কি বিরাট অন্ধকার!

৩

শয্যায় পড়িয়া বিশোকা রাজার কথাই ভাবিতেছিল। কি মুগ্ধ চাহনি, কি মিষ্ট সুর, কি সরল তাঁর প্রাণ! কিন্তু এ’ কি!—এ কি হেঁয়ালির কথা! সে দেবতার নয়,—পুরোহিতের! না, সে দেবী—সে দেবী!—দেবতার চরণে বিক্রীত এ দেহ,—ইহাতে অপর কাহারও অধিকার নাই। নৃপতি হয় ভ্রান্ত, না হয়—না, ইহাও

অসম্ভব! সে কণ্ঠে ত ছলনার আভাষ নাই! তবে,—এ' কি তবে? এ কথা তবে কেন তিনি বলিলেন? ভ্রান্তি—? বোধ হয় তাঁর ভ্রান্তিই!

গৃহ-দ্বার মুক্ত ছিল, আহার্য্য সে স্পর্শও করে নাই, শয্যার আস্তরণ স্থানচ্যুত হয় নাই। তাহারই উপর বালিকা আপনার সুসজ্জিত তনুখানি ঢালিয়া দিয়াছিল। সদাশিব দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিলেন, "বিশোকা!"

কে ও! ও' কে ডাকে? ধড়মড়িয়া কিশোরী উঠিয়া বসিল। *না, ভয় নাই! এ' যে, প্রধান পুরোহিত স্বয়ং আসিয়াছেন!*

সদাশিব অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "রাজা তোমায় কি পরামর্শ দিতেছিলেন, দেবদাসি? নিশ্চয়ই এমন কোন গূঢ় কথা নয়, যাহা আমার কাছে তুমি গোপন রাখিবে? কি কথা?"

বিশোকার মনে নিমেষে সেই কণ্ঠ, সেই সুর বাজিয়া উঠিল,— 'দেবদাসী!' 'যথার্থ তাহারা…,—' অন্তরে সে শিহরিল। হয় ত এ কথা মিথ্যা না হইতেও পারে! রঙ্গিলা, অচলা—এমন কি স্বয়ং চম্পা—! সদাশিব তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া হাসিয়া কহিলেন, "কি দেবদাসি, চুপ করিয়া রহিলে যে? রাজার কথাটা বড়ই গোপন না কি?"

এ ব্যঙ্গোক্তিতে বিশোকা জ্বলিয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া সগর্ব্বে সে কহিল, "কাহারও সহিত আমার কোন গোপন-কথা নাই! তিনি আমাকে শীঘ্র এ স্থান ত্যাগ করিতে বলিলেন। তিনি বলিলেন, 'আমার বিপদের দিন আগতপ্রায়, যদি পবিত্র থাকিতে চাই, তবে যেন শীঘ্রই এ মন্দির ছাড়িয়া যাই'।"

"মন্দিরের চেয়ে রাজোদ্যানটা বড় বেশী পবিত্র বুঝি?" পুরোহিত বক্র হাসি হাসিলেন। সে হাসির ইঙ্গিত না বুঝিলেও বিশোকার কাণে তাহার সুরটা তেমন ভাল লাগিল না। সে কহিল, "না, রাজোদ্যানে তিনি আমায় তো ডাকেন নাই, তাঁহার মায়ের কাছে কাশীধামে পাঠাইতে চাহেন। তিনি বলেন, 'দেবদাসী শুধু —নামে দেবদাসী, প্রকৃতপক্ষে সে পুরোহিতেরই সেবিকা'—এ কথা—"

"তা তিনি ঠিকই তো বলিয়াছেন,—ও কি!—অমন করিতেছ কেন? যেদিন বিগ্রহের কণ্ঠে তুমি মাল্যদান করিয়াছ, সেইদিনই কি বুঝ নাই সে মালা কাহার কণ্ঠে পড়িয়াছে! পুরোহিত দেবপ্রতিনিধি, সমুদয় দেব-সম্পত্তিতে একমাত্র তাহারই অপ্রতিহত অধিকার। ইহাতে রাজার কোন হাতই নাই। রাজার সাধ্য কি, যে, তিনি এখান হইতে তোমায় সরাইয়া লইয়া যান! তুমি সর্ব্বতোভাবে আমার।"

নিমেষে তখন সমস্ত ব্যাপার বিশোকার চক্ষে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে সবই বুঝিল। সে তবে যথার্থই তাহার! দেবতার নয়? এই মানবের,—এই সদাশিব দেশপান্তের—? অনেক কথাই আজ তাহার মনে পড়িল। স্বপ্ন টুটিয়া সত্য আজ ভীষণ মূর্ত্তিতে তাহার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল।

পুরোহিত শয্যার নিকটবর্ত্তী হইয়া আসন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "তুমি নিতান্তই বালিকা, এবং অত্যন্তই নির্ব্বোধ, তাই ইহাতে এত চঞ্চল হইয়াছ, তা নহিলে আশ্চর্য্য হইবার কথা এর মধ্যে এমন কিছুই নাই। আসল কথা এই যে, তুমি রাজার রূপে মুগ্ধ,

রাজাও নিজে তাই,—কিন্তু তার কি আবশ্যক ছিল ?—রাজার অনেক আছে। মন্দির-সেবিকা রাজার জন্য নয়। এ দুরাশা তাঁকে ত্যাগ করিতেই হইবে, আর তুমিও ইহা ত্যাগ কর, রাজরাণী হওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। যে পদ তুমি পাইবে, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ পদেই আছ। রাজার সহস্র চেষ্টাও তোমায় এই [illegible] এক চুল বাহিরে লইয়া যাইতে সক্ষম হইবে না, ইহা তুমি স্থির জানিও। বরং প্রয়োজন বুঝিলে এখানে তাঁহার আগমন আমিই বন্ধ করিয়া দিতে পারি। তুমি দেবদাসী,—ধরিতে গেলে, দেব-প্রতিনিধিত্বে আমারই তুমি স্ত্রী। আমি সে অধিকার আজ হ'তে গ্রহণ করিলাম। তুমি আমারই !"

বিশোকার কণ্ঠ হইতে একটা অস্ফুট ভয়ার্ত্ত স্বর বাহির হইল। ঘৃণায় সে ঈষৎ দূরে সরিয়া আসিল, সকোপে বলিল,—"না, আমি দেবতার। পিঙ্গলেশ্বর আমার স্বামী ! আপনি আমায় অমন কথা বলিবেন না।"

"বটে ! আমি বলিব না,—আর রাজা যখন বলিতেছিলেন, তখন ত শুনিতে দিব্য লাগিতেছিল ?"

"তিনি অমন লোক নহেন, তিনি আমায় ওসব কথা কিছুই বলেন নাই। আপনি যান, নহিলে আমি বড়-ঠাকুরাইনকে সব কথা বলিয়া দিব।"

পুরোহিত আসন ছাড়িয়া উঠিলেন, মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "কি বলিবে ? চিরকালই এই প্রথা,—দেবদাসীমাত্রেই চিরদিন ধরিয়া পুরোহিতেরই সম্পত্তি—এ কথা কে না জানে ? তোমার বড়-ঠাকুরাইনই কি দেবদাসী ছাড়া ? পুরোহিতের পত্নীপদ বড়

নগণ্য নয়। বেশ, আজ আমি চলিলাম! রাজার আশা ছাড়িয়া এখন তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাও। কাল যেন তোমায় এ সব দুশ্চিন্তায় মাথা ঘামাইতে না দেখি। তুমি আর কাহারও নও,—তুমি কেবলমাত্র আমার!”

ইন্দ্রজালে সব যেন কেমন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল! স্বর্গযাত্রী চাহিয়া দেখিল,—কোথায় স্বর্গ? সে রসাতলে! সে দেবতার দাসী ছিল, তাহার কিছুরই প্রয়োজন ছিল না,—দেবতাই তাহার সকল অভাব পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু এখন কোথায় সেই দেবতা! তিনি তাঁহার মন্দিরে ভক্ত, সাধকের পূজা গ্রহণে ব্যাপৃত, আর সে—দুর্ব্বলচিত্তা মানবী, নিঃসঙ্গ নির্ব্বান্ধব, নিঃসহায়! কাতর অবসাদে তাহার শরীর মন যেন এককালে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

এক গৃহস্থ রমণী কোলের সন্তান লইয়া ঠাকুর-প্রণাম করিতে আসিয়াছিল। নিত্যই সে আসে,—কোনদিনই তাহার আসিবার ভুল হয় না, সেদিন আসিয়া হাস্য-রহস্যময়ী সুবেশ-ভূষিতা এই চঞ্চলা হরিণীকে মন্দিরে একাকিনী স্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, ধীরে ধীরে সে তাহার নিকটবর্ত্তী হইল, জিজ্ঞাসা করিল, “হাঁগা, তোমার কি হয়েচে?”

শিশু কলহাস্যে ডাকিল, “মা-ম্‌-মা!”

বিশোকা সবিস্ময়ে ফিরিয়া চাহিল। আহা, কি সুন্দর,—কি নধর-কান্তি, এই সহাস শিশু! সাগ্রহে দুই বাহু বাড়াইয়া সে শিশুকে মুহূর্ত্তে তাহার মাতৃ অঙ্ক হইতে ছিনাইয়া লইল। শিশু কল-হাস্যে মুখে মুখ দিয়া ডাকিল, “মা!” আহা, কি মধুর! কি মধুর এই মাতৃ-সম্বোধন রে! প্রাণ যে ইহার তালে তালে নাচিয়া

উঠে, বুক যে একেবারে স্নিগ্ধ হইয়া জুড়াইয়া যায়! চুম্বনের পর চুম্বনে শিশুকে সে বিব্রত করিয়া তুলিল।

নারী কহিল, "তুমি খুব ছেলে ভালবাস, বুঝি? আচ্ছা, এখন ওকে দাও। কেউ আবার দেখ্‌বে,—লোকে হয়ত এতে আমাদের নিন্দা করতে পারে।"

এ কথার কূট অর্থ বিশোকা বুঝিল না। শিশুকে সে দুই হাতে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "নিন্দা কর্‌বে, কেন?"

"তা করবে না! তোমরা হ'চ্ছ নাচওয়ালী, তোমাদের সঙ্গে কি ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েদের মিশ্‌তে আছে? তবে তুমি কি না নেহাৎ ছেলেমানুষ, আর দেখ্‌তে বড় সুন্দর, কাজেই তোমায় একটু ভাল না বেসে থাকা যায় না। আহা, এ ব্যবসা না ক'রে যদি বিয়ে ক'রে ঘর-সংসার করতে তো, কেমন হ'ত! দেখ দেখি, মেয়েমানুষ হ'য়ে এমন পোড়া কপাল! তোমাদের বুঝি বিয়ে থাওয়া হয় না?"

"পিঙ্গলেশ্বর আমার স্বামী।"

"ওমা! মানুষের আবার কখনও ঠাকুর স্বামী হয় বুঝি? ও তো কোন কাজের কথাই না, আসলে হচ্চো তোমরা নাচ্‌নেওয়ালি বড় ছোট কাজ বাপু, রূপ বেচা মন্দিরে ব'সে! বুকের পাটাও তোমাদের খুব বাবু! ভয় করে না?" বলিয়া বিশোকার শিথিল বাহুমধ্য হইতে শিশুকে টানিয়া লইয়া জননী চলিয়া গেল।

পিঙ্গলেশ্বর! এই তাহার পদ? ইহা লইয়াই সে এতদিন নিজেকে দেবীত্ব দান করিয়া আপনাকে এত ঊর্দ্ধে রাখিয়াছিল

সে নর্ত্তকী! গৃহস্থ-বধূ ঘৃণায় তাহার ছায়া স্পর্শ করিতে চাহে না! পবিত্রতম শিশুদেহও তাহার পিপাসাতপ্ত বক্ষস্পর্শে কলঙ্কিত হয়? কি দুর্বিষহ, এ জীবন! পিতা নাই, মাতা নাই, স্বামী—না, কোথায় স্বামী? তুমি দেবতা! দেবতার সহিত মানুষের এ পার্থিব জগতে, বাসনা, কামনাময় এই মানবজীবনে কিসের সম্পর্ক? পিতামাতা নাই, স্বামী নাই,—সন্তানও থাকিবে না! গৃহ, বান্ধব, আরামস্নিগ্ধ—সেবা-শীতল একটি মৃত্যুশয্যাও তাহার অদৃষ্টে ঘটিবে না! তবে হায়, কিসের আশা আছে? কিছুরই না! সে দেবতার নহে, মানবেরও নহে, শুধু দেবনামে উৎসর্গিতা, মানবের ক্রীড়াদাসী-মাত্র! হায়, মহারাজ! হায়, ক্ষুদ্র শিশু! এ অনভিজ্ঞ শূন্যতার মধ্যে এ কি দুরন্ত ক্ষুধা আজ তোমরা জাগাইয়া দিয়াছ! এই বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার মধ্যে এমন শূন্য জীবন লইয়া কি মানুষ কখনও বাঁচিতে পারে?

সন্ধ্যার ম্লান অন্ধকারে লতা-মণ্ডপের অন্তরালে আসিয়া মৃদু-কণ্ঠে রাজা ডাকিলেন, "বিশোকা—!" কেহ সাড়া দিল না। রাজার প্রাণ কি-এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় সহসা কাঁপিয়া শিহরিয়া উঠিল। অগ্রসর হইয়া তিনি আবার ব্যগ্রস্বরে ডাকিলেন, "বিশোকা—"

সহসা দূর হইতে একটা অস্পষ্ট কোলাহল বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া আসিল। ভয় বিস্ময় উত্তেজনার বিমিশ্র ধ্বনি! কোলাহল লক্ষ্য করিয়া সতর্ক ধীর পদে রাজা অগ্রসর হইলেন। মন্দিরের নিকট আসিয়া তিনি দেখিলেন, দ্বারের নিকটে অত্যন্ত ভিড় জমিয়াছে। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, তথাপি আজ আরতির শঙ্খঘণ্টা এখনও বাজিয়া উঠিল না, কেন? ভক্তবৃন্দের সে বন্দনা-গুঞ্জনও তো কই শুনা

যায় না! কেন, কেন? ব্যাপার কি? দ্বারসমীপবর্ত্তীদের প্রশ্ন করিয়া রাজা জানিলেন, দেবতার আরতি-পূজায় আজ দারুণ বাধা পড়িয়াছে!

সন্ধ্যার পূর্ব্বে দেবসেবকগণ মন্দির-সংস্কারে আসিয়া দেখে,—মন্দিরমধ্যে পূজার আসনে বসিয়া কনিষ্ঠা দেবদাসী বিশোকা মহাধ্যানে নিমগ্না। তাহার সে ধ্যান এখনও কেহ ভাঙ্গাইতে পারে নাই।

বন্ধু।

১

মধ্য রাত্রে ঘুম ভাঙ্গাইয়া স্ত্রী কহিলেন,—"ওগো শুনচো, নীচে যেন কে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে, বোধ হয় চোর!"

"ক্ষেপেচ! কোথায় আবার কে ঘুরে বেড়াচ্ছে? তুমিও যেমন! ও স্বপন দেখ্‌ছিলে।"

এই বলিয়া পাশ বালিসটাকে আলিঙ্গন করিয়া নূতন করিয়া নিদ্রার জোগাড় করিতে লাগিলাম। কিন্তু এ ব্যবস্থা টিঁকিল না। আমার স্ত্রীটি নেহাৎ একেলে, একেবারে এই বিংশ শতাব্দীরই। স্বামীর স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে তাঁর কাছে তাঁর বাসন-কোশনের আলমারি সিন্দুক-গুলার দর বেশী। তিনি কেবল কেবলই বলিতে লাগিলেন, "হ্যাগা জেগে থেকে সর্ব্বস্ব চোরের হাতে তুলে দেবে? একটিবার উঠে গিয়ে দেখ্‌বেও না?"

বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। ঠিক পরমুহূর্ত্তেই আমার নীচের ঘরের ঘড়িতে ঢং করিয়া সজোরে একটা বাজিয়া উঠিল। আঃ এত রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিয়া চোর তাড়ান! চোরের কি চোখে ঘুমও থাকে না গা?

আমার স্ত্রীও বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া সেই কাল্পনিক চোরের কল্পনাপ্রসূত পদশব্দের উদ্দেশ্যে কাণ খাড়া করিয়াছিলেন, ভীতি-পূর্ণ-কণ্ঠে বলিলেন,—"ঐগো, ঐ বড় ঘরে ঢুক্‌লো। যাবে যদি শীগ্‌গির

যাও। রূপার বাসন-কোশন, সাল, বেনারসী সমস্তই তো ঐ ঘরে আলমারিতে রয়েছে।”

মিথ্যা কথা বলিয়া আমার লাভ কি,—সাধারণ লোকের চাইতে আমি যে কিছু অধিকতর সাহসী ছিলাম, তা আমি বলিতে পারিব না। চোর ধরিবার উৎসাহের চেয়ে জিনিষ-পত্রগুলার প্রতি কতকটা মায়ায় ও তাহাদের অধিকারিণীর একান্ত কাতর অনুনয়েই আমাকে এই দুঃসাহসিক কার্য্যে দায়ে পড়িয়াই প্রবৃত্ত করিল। কটক হইতে মনের মত করিয়া এই সেদিন মাত্র কতকগুলি খুব সৌখীন রূপার বাসন গড়াইয়া আনিয়াছি। তাহাদের চমৎকার শিল্পনৈপুণ্য ও আয়নার মত *পালিসের চাকচিক্য সর্ব্বদাই নিজের ও অপর পাঁচজনের চোখে পড়িবে* বলিয়া গৃহিণী সেগুলিকে নিজের বসিবার ঘরে, কাঁচের আলমারিতে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। আমি তখনই তো তাঁহাকে এ কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। গুরুজনের কথা কাণে না তুলিলে এই রকমই হ...।

ঘরের কোণে একগাছা পাতলা বেতের ছড়ি ছিল, আলো জ্বালিয়া তাহার অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু ছেলেদের কৃপায় তাহার কোন খবরই পাওয়া গেল না। অগত্যা প্রাণটিই হাতে করিয়া নামিয়া চলিলাম। অস্ত্র আইনের কড়াকড়িতে ঘরে যা'ও বা একখানা পাঁঠাকাটা ভোজালে, একটা মাংস খোরা বড় ছুরি ছিল, তাহাও সমস্ত খোঁজা-খুঁজি করিয়া পুকুরের পাঁকের মধ্যে ফেলিয়া দিতে হইয়াছে। এসব যদি কোনদিন পুলিশের অনুগ্রহ হস্তে পতিত হয়, তবে এই ভোঁতাপড়া লোহাগুলাই 'ক্রুপ কোম্পানি'র কামানের, 'রডা'কোম্পানির পিস্তলের সঙ্গে এক পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া গিয়া, এই

চোর তাড়াইবার শক্তিহীন,—আমাকেই জর্দ্দাণ বৈশারের মত এই বিপুল সাম্রাজ্যের ভীষণ শত্রু মূর্ত্তি ধারণ করাইতে পারে।—কাজ কি বাবা! তার চেয়ে বরং আমাদের পুঁটি মাছের প্রাণটা না হয় চোর ডাকাতের হাতে গেল, গেলই। 'বাসাংসি জীর্ণানি'......'তথা শরীরাণি', না হয় 'নবানি' দেহে পুনঃ 'সংযাতি'ই হ'লেন। আমাদের তো আর মৃত্যুর পরই অনন্ত-স্বর্গ জুটিবে না। জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্তে কলুর বলদের মত ঘুরিয়া মরিতেই হইবে। তখন দু'চার বার বেশি হইলেই বা, ক্ষতি কি?

আমার স্ত্রী তখন জিনিষগুলার সম্বন্ধে একটু নিশ্চিন্ততা বোধ *করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া উঠিল,* এবং চুপিচুপি আমায় সাবধান করিয়া *দিল,—"ওগো, খুব হুঁসিয়ার হ'য়ে যাও, দেখো যেন মারে-টারে না।"*

তাহার দয়ায় একটু হাসি আসিল। রাজার চেয়ে 'রাণী' ও ঐটুকু কৃপা রাখিয়াছেন! সিঁড়ি দিয়া নামিবার কালে সত্য কথা বলিতে কি, আমার গা'টা কেমন যেন ছম্‌ছম্ করিতেছিল। না জানি, আমার জন্য সিঁড়ির নীচেতেই কি একটা অভূতপূর্ব্ব রহস্য অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে! আমি একেবারে অস্ত্রহীন, কিন্তু চোর ডাকাতেরা না কি শুনিতে পাই, অস্ত্র-আইনের এত কড়াকড়িতেও তা মানে না!

অন্ধকার রাত্রি, কোথাও আলোর ছায়াটুকু পর্য্যন্ত নাই। বাড়ীতেও আর কেহ দ্বিতীয় সাহায্যকারী ছিল না। চোরেদের গোয়েন্দা বড় সরেস! এদের পুলিশে চাকরী করিয়া দিলে খুব শীঘ্র শীঘ্র 'গ্রেড' বাড়াইয়া লইতে পারে! আমার চাকর দুটিই যে আজ বাড়ী থাকিবে না, সে খবর তারা উত্তমরূপে জানিয়া শুনিয়াই আসিয়াছে।

কিন্তু কই, সত্য সত্যই কি আসিয়াছে? আসিয়াছে তো গেল কোথা?

আমারই হাতের হ্যারিকেনের আলোয় হঠাৎ দেখিতে পাইলাম,—তাইতো! চারুর কথাই যে ঠিক! বড় ঘরের দরজা খোলা, ভিতর হইতে মানুষের চলাফেরার সাবধানতাপূর্ণ মৃদু আওয়াজ পাওয়া যাইতেছে! এইবার আমার বুকের মধ্যে চলন্ত রক্ত যেন কার অদৃশ্য হিম হস্তের স্পর্শে জমিয়া আসিতে লাগিল। তবে যথার্থই আসিয়াছে? হয়ত ঘরের মধ্যের লোকটা অথবা লোকগুলা অস্ত্রধারী! এখন আমি কি করি? ছুটিয়া পলাইয়া যাইব নাকি? উপরে উঠিয়া সিঁড়ির দোরটায় খিল চাপিয়া দিই? ছেলেপিলে গুলোকে শুদ্ধ যদি কাটিয়া রাখিয়া যায়! জন্তু গুলোর তবু শিং নখ, দাঁত থাকে, আমাদের যে ভগবান তাও দেন নাই! কিন্তু পরক্ষণেই নিজের এই কাপুরুষতা নিজেরই কাছে সুপ্রচুর লজ্জার আঘাত পাইয়া সাহসের উত্তেজনায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। নাঃ পালাইব কেন? হাজার হোক্ জোয়ান বয়সটাও তো আছে। হুম্‌কি দিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ি, ভয় পাইয়াও হয়তো ওরা পালাইতে পারে। যতই সাহসের সহায় ওদের কাছে থাক, চোরের সাহস তো আর সৎসাহস নয়। ভাবিতেছি আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিব কি না?—দিলে হয়ত আমার দুর্দ্দশা তাহাদের নজরে পুরাপুরি আসিয়া তাহাদের ভয় দূর করিবে, কিন্তু না দিলে, যদি এটা হঠাৎ নিবিয়া যায়!—এমন সময় হঠাৎ পিছন হইতে কে একজন বজ্র হস্তে আমার গলা টিপিয়া ধরিল। লণ্ঠনটা অকস্মাৎ ধাক্কা খাওয়ায় আমার হস্তচ্যুত হইল বটে, কিন্তু সৌভাগ্য যে, সেটা ভাঙ্গিল না, বা—এমন কি কাৎ হইয়া

পড়িয়া একটা অগ্নিকাণ্ডও ঘটাইল না! আমিও তখন অবশ্য প্রাণের দায়ে হাত ছাড়াইবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে তাহার সহিত ধস্তাধস্তি করিতে লাগিলাম, কিন্তু পারিব কেন? কুস্তির আখড়া প্রভৃতি যেদিন হইতে পুলিসের নজরবন্দী হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন হইতে ওসব বালাই আর রাখি নাই। কিন্তু এ ব্যক্তিকে অবশ্য পুলিশকে লুকাইয়াও সবই অল্পবিস্তর অভ্যস্ত রাখিতে হইয়াছে!

অবশেষে আমার আততায়ী আমাকে কবির ভাষায় বলিতে গেলে, 'উৎপাটিত-মূল তাল তরুর ন্যায়' মাটিতে ফেলিয়া আমার বুকের উপর হাঁটু দিয়া আমার টুঁটি টিপিতে গিয়াই সহসা আমায় ছাড়িয়া দিল। যেন চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া অতি বিস্ময়ে অকস্মাৎ সে কহিয়া উঠিল, "একি! তুমি?"

আমিও এই আকস্মিক অভিব্যক্তিতে একেবারে অবাক্ হইয়া পূর্ণ কৌতূহলে চোরের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। নিজের এখনকার সঙ্গীন অবস্থা শুদ্ধ আর যেন মনেও রহিল না। আমাকে দেখিয়া সে যেমন বিস্ময়ে লাফাইয়া উঠিয়াছিল, ঠিক তেমনই ভাবেই উঠিয়া বসিয়া আমিও বলিয়া উঠিলাম, "এ' কি!—এযে নীলমাধব!"

হ্যাঁ সে নীলমাধবই বটে! এতদূর অধঃপতন তার সম্ভব মনে না করিলেও, সে যে কোন খানে একটা সমাজ নিন্দিত দুর্ব্বহ জীবন বহন করিতেছে, আমার মনেও এই রকমই একটা ধারণা কেমন করিয়া কেজানে জন্মাইয়াছিল। এই নীলমাধবই কটক কলিজিয়েটে আমার সঙ্গে কিছু দিন পড়িয়াছিল। সেই সময়েই তাহার সহিত আমার পরিচয়,—শুধু পরিচয়ই বা বলি কেন? বুঝি একটা ভাসা ভাসা বন্ধুত্বও কিছু দিনের জন্য উভয়ের মধ্যে জন্মিয়াছিল। তারপর

বহু দিনই দুজনে ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে। দুজনের জীবনের গতি দুই দিকে বহিয়া গিয়াছিল, তাই পরস্পরের মধ্যে দূরত্বও আসিয়া পড়িয়াছিল অনেকখানিই। পৈতৃক যথাসর্ব্বস্ব পান ভোজন এবং তাহার আনুষঙ্গিক আরও অন্যান্য পাঁচ রকমে খরচ করিয়া ফেলিয়া বড়লোকের নিঃস্বছেলে মিত্রই একদিন সেই পুরাণো বন্ধুত্বের দাবী দিয়া আমার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং 'কাল দিব' বলিয়া কুড়িটি টাকা ধার লইয়া সেই যে সে সরিয়া পড়িয়াছিল, তারপর আজ সাত বৎসর পরে আবার এই সাক্ষাৎ!

"এটা আমার বাড়ী ব'লে জান্‌তে না বুঝি?—না, জেনে শুনেই এখানে এসেছিলে নীলমাধব?"

নীলমাধব মাথা হেঁট করিয়া রহিল, তারপর কষ্টে একটু মুখ তুলিয়া যেন লজ্জায় মরিয়া গিয়া কহিল, "ঈশ্বর জানেন মণি, তা জান্‌লে আজ আমাকে এতবড় লজ্জায় ও পাপে লিপ্ত হ'তে হ'তো না। উঃ! আমি করেছি কি? অ্যাঁ! মণি, ভাই! আমায় একটু জল দেবে? উঃ—"

এক মুহূর্ত্তেই সব ভুলিয়া গেলাম। স্ত্রী যে উপরের ঘরে ভয়ে অর্দ্ধমৃত হইতেছে, সে কথাও তখন আর মনে রহিল না। মনে রহিল না,—যে, সে চোর,—সে আমার বন্ধু নয়। তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম "এসো।" বলিয়া তাহাকে অন্য একটা ঘরে লইয়া গিয়া আলোটা বাড়াইয়া দিয়া এক গ্লাস জল গড়াইয়া তাহার হাতে দিলাম। তাহার জলপান করা হইয়া গেলে, নিজেও এক গ্লাস জল নিমেষে নিঃশেষ করিয়া দারুণ কণ্ঠশোষ নিবারণপূর্ব্বক একখানা চৌকিতে বসিয়া পড়িলাম এবং তাহাকে অন্য খানাতে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সঙ্গে আর কেউ আছে?"

সে লজ্জাক্লিষ্টমুখ নত করিয়া বলিল, "আমায় অতটা মন্দ ভেব না মণি, না আর কেউই না। এই আমার প্রথম অপরাধ, আর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এই-ই শেষ। উঃ! আমি কি হয়েছি! প্রাণের ভয়ে শেষে তোমাকেই কি না খুন ক'রে ফেল্‌তে যাচ্ছিলাম! ধিক্কার হ'য়ে গেছে এমন জীবনে!"

একটু ভর্ৎসনার সঙ্গেই বলিলাম, "এই কি এখন তোমার জীবিকার উপায়? এর চেয়ে কি কোন ভাল কাজই তুমি এই এত বড় জগৎটার মধ্যে থেকে খুঁজে বা'র করতে পার্‌লে না নীলমাধব? না হয়, আমার কাছে তুমি এতদিন আসো নি কেন? আমি বোধ হয় তোমায় তা খুঁজে দিতে পার্‌লেও পার্‌তুম।"

নীলমাধব এইবার কাঁদিয়া ফেলিল, কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল, "তবে আমার সমুদয় কথা তোমায় খুলেই বলি শোন মণি, শুন্‌লে তুমি আমার উপর আর রাগ কর্‌তে পার্‌বে না; বরং তোমার আমার 'পরে তখন দয়াই হবে। তুমি জানোতো মণি বড়লোকের ছেলে ছিলুম, বাবা মর্‌বার পরেই পাঁচদিক্ থেকে পাঁচটা বওয়াটে বন্ধু জুটে, আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লে। তারপর যখন সর্ব্বস্বান্ত হলুম, তখন তারা আমায় ফেলে যে'যার স'রে দাঁড়ালো। চাকরী দু-তিনবার জুটিয়েছিলুন কিন্তু রাখ্‌তে পারিনি! অভ্যাস নেই, খাট্‌তে পারিনে; হাতের লেখা ভাল না, ইংরেজি বড় কাঁচা এই সব কারণের একটা না একটা ঘটে অনেক দুঃখের কাজটি বারে বারেই খোয়া গেল। তার উপর নানান্ রোগেও ধরেচে। দেখ্‌চো তো শরীরে আর আমার আছে কি? এই তো দশা, এর উপর আবার এক মুমূর্ষু ব্রাহ্মণের শেষ অনুরোধ ঠেল্‌তে না পেরে, তরঙ্গিণীকে বিয়ে ক'রে

তখন কি যে মতিচ্ছন্ন ধর্‌লো, মনে কর্‌লুম জীবনে তবুও তো একটা ভালকাজও করা হবে, কিছুই তো কখন করিনি। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, সেই পুণ্যের লোভই আমার এই পাপের বোঝা বৃদ্ধি করতেই ঘাড়ে চেপেছিল। আমার অবস্থাটা তুমি একবার ভেবে দেখ মণি! তবু তব আমার ধৈর্য্যে পৃথিবী! এত কষ্টেও সে কখন আমায় মুখ ফুটে একটি কথাও বলে না;—সমস্তই নিজের সেই অস্থিচর্ম্মসার বুকের মধ্যে পূরে রেখে দেয়। খেটে খেটে তার সর্ব্ব শরীরের হাড়গুলি গোণা যাচ্চে, সমস্ত দেহের লজ্জা নিবারণ কর্‌তে পারে এমন একখানি আস্ত কাপড়ও তার পরনে নেই। তার উপর ছেলেমেয়েগুলির খাওয়া, রোগ, মৃত্যু;—"

হঠাৎ আমার হৃদয়ে করুণার উৎস উথলিয়া উঠিল, একটুখানি কাছে সরিয়া আসিয়া রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কটি ছেলে মেয়ে?"

""চারটি" বলিয়া নীলমাধব নেত্রমার্জ্জনা করিল। তাহার কঠোর কণ্ঠ রুদ্ধ বাষ্পে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছিল গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া আবার সে বলিতে লাগিল, "ছুটি ছেলে, ছুটি মেয়ে, ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ কঙ্কাল ক'খানা,—সেকি আর ছেলেমেয়ে! পেটে তারা খেতে পায় না মণি, দিনের পর দিন উপবাসেই হয়ত কেটে যাচ্চে তাদের। এ কথা তুমি হয়তো মনের মধ্যে কল্পনাই কর্‌তে পার্ব্বে না! মনে কর্‌বে, এ হয়তো কোথা থেকে একটা মিথ্যা গল্প ফাঁদ্‌তে বস্‌লো! কিন্তু তোমার দিব্য কিছুই বাড়িয়ে বলিনি। ভেবে দেখ,—তোমারও তো ছেলেমেয়ে আছে?"

'ভাবিবার' পূর্ব্বেই আমার সমস্ত গায় কাঁটা দিয়া উঠিল।

নীলমাধব বলিতেছিল, "আমার সন্তান সব না খেয়ে মর্‌তে বসেচে, আর রাস্তার দুধারে দোকান ভরা ভরা খাবার জিনিষ! বড় লোকের ঘরে *সিন্ধুক ভরা ধন, ঘর ভরা উপকরণ, সুখাদ্য-পুষ্ট ছেলে মেয়ে!* ভেবে দেখ দেখি মণি, এ' কি প্রলোভন!" এ কি ছাড়া যায়?

সে আমার মুখের উপর তাহার দুই জ্বালাপূর্ণ চক্ষু স্থির করিল। তাহার মধ্য হইতে বুভুক্ষার অগ্নি যেন সহস্রধারায় আতসবাজির মতই ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু একথাও ঠিক, সে যা বলিয়াছে, তা কিন্তু অস্বীকার করিবার যো'ও নাই। আমার 'অজিত,'—আমার 'নীহার!'—না না, বাপ কি সন্তানের ওরকম দুর্দ্দশা নিজের ইহ পর কোন লোকের কোন সুখের জন্যই সহিতে পারে!

উঠিয়া চোরের হাত বন্ধুর হাতের মত করিয়াই ধরিলাম, বলিলাম,—"নীলমাধব! তুমি বলেছ, এই তোমার প্রথম চেষ্টা, এখনও তোমার হাত পাপের অর্জ্জনে কলঙ্কিত হয়নি! তুমি তোমার স্ত্রী পুত্রের জন্য সাধু পথে উপার্জ্জন করবে?—বেশ! আমি কালই তোমায় আমার ভগ্নীপতির আফিসে ঢুকিয়ে দেবো। অন্ততঃ পনের কি কুড়ি টাকা ক'রেও তুমি এখন থেকেই পেতে পার্‌বে।"

নীলমাধব বোধ করি আনন্দেই কথা কহিতে পারিল না, কেবল রুদ্ধবাক্ হইয়া নীরবে কৃতজ্ঞ নেত্রে চাহিয়া দেখিল। হায়রে অভাগা! এদের জন্য লোকে এমন সহজ পন্থা থাকিতে কেনই যে মোটা চেন, আর লোহার দরজার সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে বলিতে পারি না।

বলিলাম, "আজ তবে যাও—কাল আমি নিজেই তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাবো। হাঁ,—ভালকথা কোথায় তুমি থাকো?" পাছে দিনের আলোয় লজ্জায় সে আমার কাছে মুখ দেখাইতে না পারে, তাই

জন্যই ঠিকানাটা, জানিয়া রাখিতে ও নিজেই দেখা করিতে যাইতে ইচ্ছুক হইলাম। আহা! একটা পতিত জীবন যদি আমার একটুখানি চেষ্টায় চিরদিনের জন্যই রক্ষিত হইয়া যায়, তা এইটুকুও আর আমি করিতে পারিব না!

নীলমাধব আস্তে আস্তে বলিল, "রাণীদীঘির পশ্চিম পাড়ে একটা খোলার ঘরে আমি থাকি। তুমি যাও, না যাও,—আমি নিজেই তোমার কাছে কাল আস্‌বো।--কি জানি, যদি তুমি ভুলেই যাও। দেরি হ'লে আমার বড় ছেলেটি মারা পড়্‌বে। ক'দিন থেকে তার টাইফয়েডের মতন তীব্র জ্বরে আচ্ছন্ন অবস্থা হ'য়ে আছে। অথচ না ওষুধ না পথ্য, তারই জন্য আজ ভদ্রঘরে জন্মানর সকল সঙ্কোচ ত্যাগ ক'রেই এই কাজ কর্‌তে এসেছিলুম মণি,—" নীলমাধব হঠাৎ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া থামিয়া গেল। বুঝিতে পারিলাম—সে কাঁদিতেছে।

আহা সে কান্না যে বড় বুকফাটা কান্না—আমারও চোখে জল আসিতেছিল। পকেটে হাত দিয়া দেখিলাম,—পকেটে একখানা দশ টাকার নোট রহিয়াছে। তাড়াতাড়িতে কামিজ পরিবার বিলম্ব না করিয়া কোটটাই কি টানিয়া গায়ে দিয়া আসিয়াছিলাম! ভগবানের কত দয়া দেখ! তাড়াতাড়ি তাহার হাতে সেটা গুঁজিয়া দিয়া তাহার সলজ্জ আপত্তি না মানিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সে যে কি করিবে ঠিক না পাইয়া আমার পায়ের ধূলা তুলিয়া লইয়া মাথায় ছোঁয়াইল।

হাত ধরাধরি করিয়া দুজনে ঘর হইতে বাহির হইতেছি এমন সময় কে একজন,—বোধ করি আমাদেরই সাড়া পাইয়া ছুটিয়া পালাইয়া

যাইতেছিল,—হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, "একি তুমি কার সঙ্গে কথা কইছিলে?" বোধ হইল বিস্ময়ে সে যেন সেইখানেই জমিয়া গেল

আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বে নীলমাধব তাহাকে নমস্কার করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "বৌ ঠাকুরাণি! অভাগা আপনাদের বড়ই কষ্ট দিয়েছে মাপ কর্ব্বেন। মণীন্দ্রকে সব বলেছি তার কাছে আপনি জগতের সবচেয়ে একটি দুঃখের কাহিনী এক্ষুণি শুনতে পার্বেন 'খন। নীলমাধবের নাম শোনেননি? আমিই সেই হতভাগা নীলমাধব।"

চারু তেমনি আড়ষ্ট হইয়া চাহিয়া রহিল। আমি বহির্দ্বার পর্য্যন্ত তাহার অনুসরণ করিলাম। বহির্দ্বার নাকি খোলাই ছিল। চাকর বাবুদের কীর্ত্তি! এ অবস্থায় সে কেমন করিয়া এই মুক্ত দ্বার গৃহ প্রত্যাখ্যান করিতে পারে? আহা বেচারা!

"দেখো ভাই, ভুলে যেওনা। তোমার কৃপার উপর দু'টি মানুষের বাঁচন মরণ নির্ভর ক'রে রইলো, আমার জীবনের শেষদিন অবধি এই রাতটা স্মরণ থাক্‌বে। এখন কিন্তু আর একটা কথা মনে হচ্চে;—মনে হচ্চে,—ভাগ্যে আমার অতবড় মতিচ্ছন্ন ধ'রেছিল মণি, না হলে তো তোমার এই অতুল স্নেহের মধ্যে এমন ক'রে এসে পড়্‌তে পারতুম না! সেই কত দিনের ধার নেওয়া টাকা ক'টার লজ্জায় আর তো তোমায় মুখ দেখাতেই পাচ্ছিলাম না।"

গভীর সহানুভূতিপূর্ণ স্নেহে বন্ধুকে প্রথম জীবনের মতই সানন্দে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম,—"তার জন্য কি আট্‌কাতো মাধব? তা যাই হোক, সে যা হয়েছে, হ'য়ে গেছে। কাল সন্ধ্যালেই তুমি আমায় তোমার ওখানে দেখ্‌তে পাবে।"

ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, বারান্দায় রেলিংএ ঠেস দিয়া চারু বসিয়া আছে, আমায় দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, "আমার জন্মে এমন আশ্চর্য্য আমি কখন হইনি।"

"আমিও না," বলিয়া আমি তাহার পাশে বসিয়া পড়িয়া আনুপূর্ব্বিক সমুদয় ঘটনা তাহার কাছে বর্ণনা করিলাম।

কাহিনীর প্রথম দিকটাতেই চারু শিহরিয়া একবার বাধা দিয়া উঠিয়াছিল, "মাগো! ওটাতো তাহলে খুনে!"

তারপর বলিতে লাগিল, "তোমায় পাঠিয়ে দিয়ে অবধি এম্‌নি ভয় কর্‌ছিল যে তা' আর কি বল্‌বো! কেবলই মনে হ'তে লাগ্‌লো কি ছাই পাঁশ জিনিষের জন্যে তোমায় কোথায় বিপদের মধ্যে ঠেলে পাঠালুম। কোন সাড়া সুড়িটিও পাই না। শেষে আর থাক্‌তে না পেরে নিজেই নেমে এসেছিলাম।"

তারপর সব কথা শুনিয়া সে বেদনাব্যথিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, "আহা-হা, এতে আর চুরি না ক'রে করে কি? তা তুমি আমায় একটু বল্লে না কেন, ঘরে সন্দেশ আর গজা ছিল খানকতক না হয় ছেলেপিলেদের জন্যে দিয়ে দিতুম।"

আমি সানন্দে তাহাকে আদর করিয়া বলিলাম, "এই তো চাই! তা আমিও তাকে একেবারে বঞ্চিত করিনি, একখানা দশ টাকার নোট ছিল দিয়ে দিয়েছি। এখন চলো ওপরে যাই। অনেক রাত এখনও রয়েচে, ঘুম যদিও আর হবে বোধ হয় না।"

চারু উঠিতে গিয়া কি ভাবিয়া আবার বসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওর সঙ্গের লোকটা তবে কে'গা?"

"সঙ্গের লোক? না না সঙ্গে ওর কেউ ছিল না তো।"

"বাঃ ছিল না কি? আমি নিজের চক্ষে একটা লোককে একটা বোঁচকা ঘাড়ে ক'রে ছুটে পালাতে দেখেচি। 'ছিল না' তুমি বল্লেই হবে!"

হঠাৎ তখন একটা সম্ভাবনা যেন দুজনকার মনেই এক সঙ্গে জাগিয়া উঠিল। চারু হ্যারিকেনটা তুলিয়া লইয়া উৰ্দ্ধশ্বাসে প্রথমে বড় ঘরের দিকেই ছুটিয়া গেল। আমিও হতবুদ্ধির মত তাহার অনুসরণ করিলাম।

সেখানে কি রকমটা দেখা গেল?—আলমারির দুটি কবাটই খোলা,—আর তার মধ্যকার সমস্ত রৌপ্য, মায় তাহাদের গঠন-সৌকুমার্য্য, সমস্ত ঔজ্জ্বল্য নিশ্চিহ্নরূপে সেখান হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে!

বলা বাহুল্য পরদিন রাণীদীঘির চতুঃপার্শ্বের ত্রিসীমানার মধ্যে নীলমাধবের বা তাহার 'খোলার' ঘরের কোন চিহ্নই খুঁজিয়া মিলে নাই। দীঘির 'পশ্চিম তীরে' শুধু একটা প্রকাণ্ড বটগাছ অনেক দূর অবধি নিজের কাচ্চা বাচ্চা গুলি লইয়া ঘর-কন্না করিতেছে এই দেখিলাম। দুর্ভিক্ষের সহিত ইহাদের কোন খবর আছে বলিয়াই বোধ হইল না, শ্যামল সুন্দর এবং সতেজ।

ইহার পর আর থিয়েটার দেখিতে যাই নাই। থিয়েটারের কোন অভিনেতাকে তেমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় করিতে দেখিতে পাই না। নীলমাধব কেন সেখানে না গিয়া এপথে আসিল মধ্যে মধ্যে একথাও আমি ভাবি। যদি আবার কখন তার সঙ্গে দেখা হয় শুধু এই উপদেশটুকুই এবার তাহাকে দিবার ইচ্ছা আছে।

দান।

১

যখন কনভেণ্টে পড়িতে যাইতাম সেখানকার সুসংযত শৃঙ্খলা ও সুব্যবস্থিত শিক্ষাদান আমার বালিকা-হৃদয়কেও বিস্মিত করিয়াছিল। সেখানকার সেই উচ্চ প্রাচীরের বেষ্টনী-মধ্যে কে যেন আর একখানি জগৎ, আমাদের এই ধূলি-রৌদ্র-মলিন ঝঞ্ঝাবাতা-পীড়িত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন, প্রশান্ত শান্তি ও অচ্ছেদ্য প্রেমের দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছে। সেখানকার অধিষ্ঠাত্রী যাঁহারা,—তাঁহারা যেন সে শান্তিরাজ্যের দেবতা। এমন নিঃস্বার্থ, পবিত্র, উৎসর্গিত-জীবন জগতে অল্পই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আমাদের ঘরেও এসব পুণ্য প্রতিমার অভাব নাই, কিন্তু তাঁহাদের উদারতা ও উৎসর্গ এমন বিশ্বব্যাপী হইতে সুযোগ ও সাহায্য পায় না, তাই তাহা ইহাপেক্ষা কতকটা যেন সীমাবদ্ধ।

আমি সেই জপের মালা ও ক্রশ চিহ্নধারিণী গাম্ভীর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি, স্থূল অবগুণ্ঠনে অর্দ্ধ গুণ্ঠিতা 'নান'দের পানে নির্ব্বাক্-বিস্ময়ে শ্রদ্ধাবনত-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতাম। তাঁহাদের সর্ব্বত্যাগী অথচ সার্ব্বজনীন প্রেম আমার কাছে অনন্ত আকাশের মতই রহস্যপূর্ণ ঠেকিত। তাহা আপনার গৌরবে আপনিই পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, আপনাকে লুকাইবার এত চেষ্টা তাহাকে শতরূপে শতদিক্ হইতে যেন অধিকতর ব্যক্ত করিয়া দেয়। নিষ্কাম ধর্ম্মের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বণিক্ জাতির মধ্যে পাওয়া

যেন স্বপ্নের মতই অসম্ভব বোধ হইত। ইহাদের মত জগতের কাজে, আর্ত্তের সেবায়, অনাথের পালনে, শিশুর লালনে নিজেকে নিঃস্বার্থ ভাবে উৎসর্গ করিয়া দিতে আমার সমস্ত হৃদয় ভিতরে ভিতরে জোয়ারের জলের মতই যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে থাকিত। তাই প্রতিদিন বাড়ী ফিরিবার সময় প্রতিদিনের চেয়ে যেন বেশী করিয়া শ্রদ্ধানুভব করিতাম।

আমাদের সঙ্গীত-শিক্ষয়িত্রী কুমারী 'গ্রেস্' আমার নিকটে একটি জটিল রহস্যের মতই অবোধ্য ছিলেন। আমাদের তপস্বিনী উমার ন্যায় তাঁহার অত্যন্ত সুন্দর তরুণ মুখখানি এবং যৌবনের পূর্ণ বিকশিত টল-ঢল লাবণ্য, যদিও কঠোর তপস্যার উপবাস-ক্লেশে এবং বিশ্রী পরিচ্ছদ ও মাথার পুরু কাপড়ের অবগুণ্ঠনের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে শ্রীহীন ও ম্লান হইয়া গিয়াছিল তবুও ভস্মে যেমন আগুনের জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ ঢাকিয়া রাখিতে পারে না, তেমনই সেই পাদচুম্বিত প্রকাণ্ড মোটা কাপড়ের সুদীর্ঘ পোষাকে তাঁহার সাধারণ দুর্ল্লভ আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যকে কোনমতেই লুকাইয়া রাখিতে সক্ষম হইত না। তা তিনি নিজেও বোধ হয় সে কথা ভালরকমই জানিতেন। সেই জন্য তাঁহার সূক্ষ্ম গোলাপী ওষ্ঠ-প্রান্ত মধুর হাস্যচ্ছটায় বিমণ্ডিত হইয়া উঠিতে না উঠিতেই সুগভীর গাম্ভীর্য্যদ্বারা তিনি তাহাকে [illegible]ভাবেই চাপিয়া ফেলিতেন। তাঁহার সুসংযত স্বল্পভাষা যদি কোনদিন একটুখানি অসংযত হইবার উপক্রম করিত অমনি চকিত হইয়া আত্মসংবরণ করিয়া লইতেন। এমন কি যখন আমার প্রাত্যহিক অভিনন্দন ফুলের তোড়াটি তাঁহার হাতে দিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিতাম, 'সুপ্রভাত' জানাইবার সময় তাঁহার কণ্ঠে এমন একটি মধুর রাগিণী

বাজিয়া উঠিত,—তাঁহার কোমল হাতখানির স্পর্শ এমন একটি অপ্রকাশ্য স্নেহে আমার অঙ্গে অঙ্গে হিল্লোলিত হইয়া উঠিত যে, আমি তাঁহার পানে বিস্মিত কৃতজ্ঞ দৃষ্টি না তুলিয়া থাকিতে পারিতাম না। দেখিতে পাইতাম, যদি সেই সময় তাঁহার নীলকান্ত মণিপ্রভ ছুটি চোখ আমার চোখের প্রতিচ্ছায়ায় ঈষৎ কৃষ্ণোজ্জ্বল হইয়া উঠিত, তৎক্ষণাৎ তিনি স্থির গাম্ভীর্য্যাবলম্বন করিয়া শিক্ষয়িত্রীর উপযুক্ত মর্য্যাদার সহিত সস্নেহে বলিতেন, "আজ তুমি খুব সকাল সকাল এসেছ" আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতাম হৃদয়ের কোনপ্রকার দুর্ব্বলতা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ না করিয়া ফেলা, তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা। যেন এখান হইতে তিনি নিজে এতটুকু কিছু লইতে চাহেন না, অথচ নিজের সর্ব্বস্ব অন্যকে দু'হাত ভরিয়া দান করিতেছেন। কিন্তু এ'ও সত্য যে, তাঁহার এই সর্ব্বদা প্রচ্ছন্ন থাকিবার চেষ্টা—সর্ব্বদাই যেন ব্যর্থ হইত। কোমলতা ও করুণা তাঁহার সেই গাম্ভীর্য্যের ছায়াযুক্ত প্রশান্ত মুখে, তঁহার কোমল কণ্ঠস্বরে আর সেই দেবকন্যাতুল্য ধীরশান্ত পদবিক্ষেপে ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িত। তাঁহার সঙ্গীতময় কণ্ঠের সঙ্গীত-ধ্বনিও যেমন লাগিত, তাঁহার স্নেহপূর্ণ সম্বোধনটিও তেমনি মিষ্ট লাগিত। একদিন আর থাকিতে পারিলাম না। অনিবার্য্য কৌতূহলে হঠাৎ আমার সঙ্গীত শিক্ষার অবকাশে বলিয়া ফেলিলাম, "আপনার মত জীবন পাইতে আমার বড় সাধ হয়"—সে ঘরে তখন কেহ উপস্থিত ছিল না, বোর্ডিং-এর মেয়েরা সে ঘর ছাড়িয়া গিয়াছিল, আমি আর একটা নূতন গৎ শিখিবার জন্য তখনও ছুটি পাই নাই। তিনি যখন নূতন করিয়া শিক্ষা দিবার জন্য পিয়ানোর উপর আবার তাঁহার শুভ্র অঙ্গুলিগুলি স্পর্শ করিয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ আমি এই কথাটা বলিয়া ফেলিলাম।

কিন্তু বলিয়াই বোধ হইল, কথাটা বলা হয়ত আমার উচিত হয় নাই। কেন না দেখিলাম, এই কথা শুনিয়াই তিনি হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন। এতখানি চমকাইলেন যে, তাহা স্পষ্টই আমার সুগোচর হইল। আমি ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া থমকিয়া থামিয়া গেলাম, লজ্জিতভাবে ধীরে ধীরে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম, বলিলাম, "আমায় ক্ষমা করুন, এ উচ্চাকাঙ্ক্ষা করা বোধ করি আমার অন্যায় হইয়াছে!"

কুমারী গ্রেস্ মুখ তুলিয়া সস্নেহে কহিলেন, "আকাঙ্ক্ষা তো উচ্চ হওয়াই উচিত।" আমি দেখিলাম, তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁহার মুখ ঈষৎ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং গলার স্বর কম্পিত হইতেছে। মনে বড়ই কষ্ট বোধ হইল, কিসে আমি তাঁহাকে আঘাত করিয়াছি! কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ব্যথিত হইলাম। আত্মসংবরণ অসম্ভব হইয়া উঠিল, আমাদের মধ্যকার ব্যবধান-সম্বন্ধ সব ভুলিয়া গিয়া, অজ্ঞাত কোন সুগভীর বেদনার একমাত্র সহানুভূতিতে বিগলিতচিত্তা সখীর ন্যায় সহসা প্রশ্ন করিয়া ফেলিলাম,—"আমি কি আপনাকে না জানিয়া আজ বেদনা দিলাম?"

তিনি এবার আমার পানে তাঁহার সেই নীলপদ্মের মত চোখদুটি ফিরাইলেন, ঈষৎ ক্ষীণহাসি মুহূর্ত্তে তাঁহার দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠপ্রান্তে চকিত হইয়া উঠিল, মৃদুস্বরে কহিলেন, "না তুমি আমায় আঘাত দাও নাই, তোমার কথায় আমার একটি পুরাতন কথা মনে পড়িয়াছিল মাত্র। তোমার বালিকা-হৃদয় আজ যে সংসার-বহির্ভূত ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট বোধ করিতেছে, তোমার মত বয়সে একদিন আমিও সেই প্রকার আকৃষ্ট হয়েছিলাম। তারপর সে আকর্ষণ কাটাইয়া সংসার যখন শত

প্রলোভনের জাল পাতিয়া আমায় তার লৌহ-নিগড়ে বাঁধিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময় আমার শুভাবসরের বরেণ্য দেবতা আমায় সেথান হ'তে উদ্ধার করিয়া তাঁহার শান্তিময় অঙ্কে তুলিয়া লইয়াছেন। সেই কথা স্মরণে আমি আমার প্রতি তাঁর অসীম দয়ানুভব করিয়া বিস্ময় ও আনন্দে আত্মবিস্মৃত হ'য়েছিলাম। ঈশ্বর এবং তাঁর পুত্র এত দয়া কোনও ব্যক্তিকে এত সহজে করেন না। সর্ব্বজীবে সমদর্শী হ'লেও আমার উপরে তাঁহার করুণা যেন পক্ষপাতপূর্ণ এমনও আমার মনে হয়।"

আমি এক সঙ্গে এতগুলা কথা তাঁহার মুখ হইতে আর কখনও শুনি নাই; বিস্মিত হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলাম। তিনি তাহা দেখিলেন, তাঁহার সেই স্বভাবসিদ্ধ মৃদু গাম্ভীর্য্যের হাসি একটুখানি হাসিয়া আমার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া সস্নেহে কহিলেন, "আমি তাঁহা হ'তে স্বতন্ত্র করিয়া আর কাহাকেও কখন ভালবাসিব না বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম কিন্তু তুমি আমাকে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে দাও নাই, আমার 'পরে তোমার প্রেম আমার দৃঢ় চেষ্টাকে আজকাল সর্ব্বদাই ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। তাই ভাবিতেছি আজ আমি তোমায় আমার গল্প শুনাইব; শুনিয়া তুমিই বুঝিয়া দেখো আমার এই কঠোর নিয়মপূর্ণ জীবনের মাঝখানে তুমি বিদেশী বালিকা,—তোমার অধিকার বিস্তৃত করা আমার পক্ষে কতখানি হানিকর। আমরা রোমান-ক্যাথলিক, নিয়মভঙ্গের দণ্ড আমাদের অত্যন্ত কঠিনরূপেই গ্রহণ করিতে হয়। আমি মনে মনেও যদি নিজের কাছে অবিশ্বাসী হই, আর কেহ না জানিলেও সে পাপ সর্ব্বান্তর্যামীর দিব্যদৃষ্টিতে লুকান থাকিবে না, আমার নিজের কাছেও

তো তাহা অবিদিত নাই, তা অপরে না জানিলে, না দিলেও নিজের পাপের দণ্ড আমি নিজেই নিজেকে দিতে বাধ্য। আজ আমি তোমায় আমার প্রথম জীবনের সকল কথা বলিতেছি শুন, কিন্তু তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা, কাল হইতে তুমি আর আমার কাছে শিখিতে চাহিও না অন্য কেহ এভার লইবে এই ব্যবস্থা করিয়াছি। আমি যাঁহার জন্য সমস্ত ছাড়িয়াছি, একমাত্র তাঁহাকে ছাড়িয়া এমন কি বিচ্ছিন্নভাবে তোমায় ভালবাসিলেও তাঁর কাছে অপরাধিনী হইব।

আমি ঘোর বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া শুদ্ধ মাথা হেলাইয়া সম্মতি জানাইলাম, অনিচ্ছা সত্ত্বেও অস্বীকার করিতে সাহস হইল না। কুমারী গ্রেস্ তখন আমার খুব কাছে চেয়ার টানিয়া লইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ;—

২

"ছোট বেলায় যে কনভেণ্ট স্কুলে পড়িতাম, সেখানকার স্বল্পভাষিণী নিয়মচারিণী স্নেহশীলা সন্ন্যাসিনীদের আমি অত্যন্তই শ্রদ্ধা করিতাম। তাঁহাদের উপবাস-কৃশ অঙ্গের পবিত্র জ্যোতিঃ ও একটি সাধারণ-দুর্লভ মহিমাময় ভাব আমার বালিকা-হৃদয়কে যেন বিস্ময়-চকিত করিয়া তুলিত। মনে হইত ইঁহারা যেন এ পৃথিবীর নন, অন্য কোনও জগতের বার্ত্তা প্রচার করিতে, কোন্ সেই অজানা দেশ হইতে এই মর্ত্তধামে আগমন করিয়াছেন। যখন খুব ছোট ছিলাম, অনেকবার আমাদের শিক্ষয়িত্রীর জানু ধরিয়া তাঁহার ক্রশ ও মালা ধরিয়া টানাটানি করিয়াছি, আমার রেশমী-পোষাক দূরে

নিক্ষেপ করিয়া বায়না ধরিয়াছি, "তোমাদের ঐ পোষাক আমায় পরতে দাও"। 'মাদার অগষ্টাইন' এ সব আবদারে কেবল স্নেহের হাসি হাসিতেন ও সস্নেহে বলিতেন, "এই বালিকাটি একটি মূর্ত্তিমতী দেবী!" তারপর যত বড় হইতে লাগিলাম, ক্রমেই আমার এ পিপাসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, একদিন ছুটির সময় বাড়ী আসিয়া মাসীমাকেও বলিয়া বসিলাম, "আমি 'সিসটার'দের কাছে দীক্ষিত হবো"; মাসীমা এ কথায় একেবারে শিহরিয়া জিহ্বা দংশন করিলেন। আমায় ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন,—"খবরদার অমন কথা তুমি আর কখন মনেও আনিও না। আমি যখন জিজ্ঞাসা করিলাম 'কেন?' তখন মাসীমা অনেক যুক্তি প্রমাণ দ্বারা জিনিষটাকে এমন জটিল করিয়া তুলিলেন যে, আমি তাহার সবটা না বুঝিলেও মনে হইল, যেন সমস্তই বুঝিয়াছি। কিছুই যে বুঝি নাই তাও না, এইটুকু বেশ বুঝিয়াছিলাম, যে,—আমার কৌমার্য্য-ব্রত গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব এবং উহা করিতে গেলে কি একটা ভয়ানক অধর্ম্ম এবং কাহারও 'পরে যেন অনেকখানি অত্যাচার করা হইবে।—আমার কল্পনা ফুরাইল!

"আর একটু বড় হইলে কথাটা আরও একটু স্পষ্ট হইয়া আসিল। আমি জানি আমি মাসীমার সুবিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, তজ্জন্যই বড় লোকের মেয়ে না হইলেও আমি অপর্য্যাপ্ত সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে শৈশব হইতেই লালিতা। কিন্তু এখন শুনিলাম মাসিমার উত্তরাধিকারিণী হইলেই তো যথেষ্ট হইল না; মেসো মহাশয়েরও নাকি একজন উত্তরাধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁহার ভাগিনেয়। আমার মাসীমা যখন আমাকে তাঁহার অর্দ্ধ-দরিদ্র ভগ্নী-গৃহ হইতে নিজের

ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত প্রাসাদ-গৃহে আনাইলেন, তখন নাকি অমার মেসো মহাশয়ের সহিত তাঁহার একটু মতান্তর হইয়া, পরে তাহা গভীর মনান্তরে দাঁড়াইয়াছিল। বৃদ্ধ মেসোমহাশয় তাঁহার পত্নীর ক্ষুদ্র আত্মীয়াটিকে তাঁহার উত্তরাধিকারিণীরূপে গ্রহণ করিতে একান্তই অসম্মত হইলেন। তাঁহার ভাগিনা 'গেব্রিয়েল'কে তিনি নাকি বরাবরই একটু বেশী করিয়া স্নেহ করিতেন, তাহাতে সকলকার— এমন কি তাঁহার নিজেরও বরাবর বিশ্বাস ছিল যে, সে-ই তাঁহার বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইবে।

"এমন সময়ে আমি একটি সুকুমারকান্তি বালিকার মূর্ত্তিতে সেই সার্ব্বজনীন ভরসাকে হঠাৎ সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়া একদিন সেই শিশু-পদ-চিহ্নহীন উদ্যান পথে অকুণ্ঠিত-সাহসে দ্বিধাশূন্য হইয়া চিন্তামগ্ন নতদৃষ্টি বৃদ্ধের নিকটে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ডাকিলাম, "মেসোমশাই"! মেসো মহাশয় চমকিয়া উঠিয়া সোৎসুক-দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিলেন, আমার বেশ মনে পড়ে, তাঁহার বিরক্তি-কুঞ্চিত ললাট মুহূর্ত্তে প্রসন্ন ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, তিনি নত হইয়া আমার ললাটে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটি সস্নেহ [illegible] অঙ্কিত করিয়া নিজের শীর্ণহাতে আমার হাত ধরিয়া লইয়া মাসী[illegible] কাছে গেলেন। তারপর কি হইয়াছিল, তখন জানিতাম না, [illegible] শুনিয়াছিলাম—সেই দিনই নাকি তাঁহার দৃঢ়সঙ্কল্প শিথিল হইয়া গিয়াছিল। ইহার ফলে মাসীমার সহিত পরামর্শ না করিয়াই আমার সপক্ষে তিনি এমন একটি উইল করিয়াছিলেন, যাহার ফল সকল সময় শুভ হওয়া মোটেই সম্ভবপর নয়;—বরং আমাদের সমাজে একটু অসম্ভব বলিয়াই আমার মনে হয়। আরও শুনিয়াছিলাম—মাসীমা প্রথমে ইহাতে

অনেক আপত্তি করিয়া শেষে দ্বিতীয় উপায় না দেখায়; অগত্যা এই নিয়মেই স্বীকৃত হইয়াছিলেন।

"সে নিয়মটি কি, তাহা জানিতে তোমার হয় তো কৌতূহল জন্মিতেছে!—সে সর্ত্ত হইতেছে এই যে, তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিতে দুইজন উত্তরাধিকারী মনোনীত হইল, কিন্তু ইহারা যদি পরস্পরকে বিবাহ করিয়া সম্মিলিত হয় তবেই একত্রে তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইতে পারিবে, নতুবা যাহার দ্বারা এই নিয়ম ভঙ্গ হইবে, সে ইহার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে এবং অপর ব্যক্তি একাকী এই বিপুল সম্পত্তি ও সম্মানের অধিকার পাইবে। যাঁহারা তাঁহার উইলের 'ট্রষ্টী' হইলেন, তাঁহাদের দ্বারা তাঁহার বিশ্বাস এতটুকু নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সেদিন মাসীমা আমাকে সেই কথাই ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তখন ছেলেমানুষ ছিলাম, অত কথা বুঝিলাম না, বুঝিলাম না যে, যে সমস্ত সংসারই ত্যাগ করিতে চাহে, তাহার তুচ্ছ ঐশ্বর্য্যে কি প্রয়োজন? তাহার একটি কপর্দ্দক পর্য্যন্তও তো থাকার আবশ্যক নাই! তখন কিন্তু শুধু বুঝিলাম, আমি একজনের জন্য বহুদিন হইতেই উৎসর্গীকৃত হইয়া আছি, আমার সেই দূরস্থ চন্দ্রমাকে সুধাপিপাসু চকোর পাখীর মত উর্দ্ধে চাহিয়া প্রতীক্ষা করা ভিন্ন আমার আর অন্য কোন পথ নাই, কার্য্য নাই, কর্ত্তব্যও নাই। সেদিন প্রথম মনে হইল তিনি কে?

"পূর্ব্বেও এ উইলের খবর আমাকে দেওয়া হইয়াছিল, একথা লইয়া এমন কি আমার দাসীরাও সুযোগ পাইলেই আমাকে অনেক উপদেশ দিত, মাসীমা তো অনেকবারই আমায় সাবধান করিয়া দিয়াছেন, যেন আমি কোনও সময় এ প্রধান কথাটা

ভুলিয়া না যাই। কিন্তু এ সব সাবধানতা সত্ত্বেও এই দীর্ঘকাল ধরিয়া আমি আমার জীবনের প্রধান চিন্তনীয়কে অচিন্ত্যপূর্ব্বই রাখিয়া আসিয়াছি। তাঁহার একথা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাই নাই। আজ হঠাৎ তাহা স্মরণ হইল। আমাদের বসিবার ঘরে ছোট টেবিলের উপর মেসো মহাশয়ের যে চামড়া বাঁধা আলোক চিত্রের খাতাখানা পড়িয়া থাকিত, বহুবার দৃষ্ট হইলেও সেদিন চুপিচুপি এক সময় সেখানা খুলিয়া ফেলিলাম এবং মোটা মোটা পাতাগুলা উল্টাইতে উল্টাইতে যেখানে মিঃ ব্রাউনের ছবি ছিল সেইখানটা বাহির করিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া তাহার দিকে চাহিতে একটু যেন কেমন সঙ্কোচ ও লজ্জানুভব করিলাম। ছবিখানা যে জড় পদার্থ মাত্র এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহাও মনে পড়িল না এবং সেই চিত্রিত কিশোরের প্রতিভা-ব্যঞ্জক মর্ম্মভেদী দৃষ্টির সম্মুখে এক মুহূর্ত্তেই যেন সমুদয় বর্ত্তমানটা বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল। সে কি নূতন ভাব! সে আমি আজ প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিব না। সেই বহুবার-দৃষ্ট আলোক চিত্র সেদিন আমার নববিকসিত-হৃদয়ে সে কি নবীন আশা সে কি নূতন আনন্দ, সে কি নব যৌবন জাগাইয়া তুলিয়াছিল! মুগ্ধা আমি, পুলক-কম্পিত-বক্ষে সেই আমারই—একান্তই আমারই জন্য যিনি কোন্ অচেনা দেশের অজানা বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতেছেন, তাঁহার প্রতিকৃতিখানা দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া গভীর প্রেমে চুম্বন করিলাম। সে চুম্বন জড়ে চেতনে—সে গভীরতা-ভরা প্রথম চুম্বন অনেকদিন পর্য্যন্ত আমি ভুলিতে পারি নাই। তাহা যেন কোন পবিত্র পুষ্পাঘ্রাণের মত আমার কৌমার-অধরকে বহুদিন পর্য্যন্ত সুরভিত করিয়া রাখিয়াছিল।—ইহারই সলজ্জ স্মৃতি-

স্মরণে অনেক দিন পর্য্যন্ত একটি হর্ষ, একটি বিস্ময় আমার বুকের মধ্যে আলোড়িত হইত। আমি মুগ্ধ-চিত্তে ভাবিতাম, ইহাই হয় তো প্রেম! হয় তো 'আইভান্‌হো'র প্রতি 'রোয়েনার' এবং 'রোমিও'র প্রতি 'জুলিয়েটে'র যে রকম একটা আত্মবিস্মৃতকারী প্রেমের উচ্ছ্বাস ছিল, এ' ও সেই বস্তু।

"তারপর অল্পে অল্পে উচ্ছ্বাস চলিয়া গেল, স্বপ্ন ফুরাইলে স্মৃতিটুকু শুধু যেমন জাগিয়া থাকে, তেমনি একটি আভাষ রহিল মাত্র। পরীক্ষা আসিয়া পড়ায় মন তাহার কাল্পনিক স্বপ্ন ভুলিয়া গিয়া বাস্তবের পানেই ছুটিয়া আসিল।

৩

"ইহার পর আরও দুই বৎসর গত হইয়া আমার সপ্তদশ বৎসর উনবিংশে পর্য্যবসিত হইল। সে বৎসরের জন্ম-দিন উপলক্ষে বাড়ী আসিয়াছি। তখনও দুই দিন ছুটি বাকি আছে, কাল রাত্রের উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আজ হইতেই নিজেকে একটুখানি প্রস্তুত করিয়া লইতেছিলাম। গানগুলা একবার মাসীমার কাছে গাহিয়া বাজাইয়া মহলা দেওয়া হইল। আমার জন্ম-দিনের উপহার দিবার জন্য মাসীমা যে অম্লানোজ্জ্বল মুক্তার কণ্ঠি ও চুণির রাঙা দুটি কঙ্কণ তৈরি করাইয়াছিলেন, সেগুলি আমায় পরাইয়া শুভ্র স্থূল সাটিনের উপর রৌপ্য-সূত্রের কারুকার্য্য করা সুন্দর পোষাকটি ও সাদা সাটিনের জুতা পরাইয়া সম্মুখে দাঁড় করাইয়া আমার আপাদ মস্তক একবার ভাল করিয়া দেখিলেন,—দেখিয়া বোধ হইল যেন তাঁহার মুখ খুব প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে প্রফুল্লতার মধ্যে অনেক খানি যে

বিজয়ের আনন্দ-গৌরব ছিল, তাহা আমি তাঁহার চোখ দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম! যেন খুব বড় সেনাপতি একটা মস্ত বড় দুর্গ জয় করিবার জন্য খুব ভাল একদল সৈন্য গড়িয়া তুলিয়াছে! আমি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমায় বুঝি কোন একটা নূতন 'অভিনয়' কাল কর্‌তে হবে?" মাসীমা আমার মুখখানা দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া সস্নেহে আমার ললাটে চুম্বন করিয়া কহিলেন,—"হ্যাঁ, মা, একেবারেই নূতন! আর আমার আশা আছে তাতে তুমি কৃতকার্য্যও হবে।"

আমার 'পরে মাসীমার স্নেহের যেন অন্ত ছিল না।

"সেদিন ও তার পর দিন উপহারের জিনিষপত্র ও নিজের সাজ পোষাক লইয়া আমি নিতান্তই ব্যতিব্যস্ত হইয়া রহিলাম! তারপর ঘরের বাতাসে ক্লান্ত বোধ করিয়া যথেষ্ট বেলা থাকিতেই আমাদের পাশের নদীর তীরটিতে বেড়াইতে বেড়াইতে নূতন গানটা আপনার মনে গাহিয়া গাহিয়া অভ্যাস করিতে লাগিলাম। তখন দ্বিপ্রহরে শীত বা কোয়াসা ছিল না। গাছের উপর বসিয়া পাখীরাও আমার সঙ্গে গলা ছাড়িয়া গান গাহিতেছিল। প্রকৃতির এই স্বাধীনচিত্ত সন্তানদের মধ্যে স্থান লাভ করিয়া আমি যেন সেই মুক্তপক্ষ বিহঙ্গিনীদের মতই উল্লাসে আত্মহারা হইয়া গেলাম। কোন কথার আর আমার স্মরণ রহিল না।

"এমন সময় পশ্চাতে শুষ্ক পত্র মর্ম্মর করিয়া উঠিল, আমাদের সঙ্গীত অতিক্রম করিয়া এক গুরু পদশব্দ আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। পিছন ফিরিয়া দেখিলাম,—একজন অপরিচিত পর্য্যাটক আমার অদূরে, উৎকণ্ঠিত নেত্রে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঈষ

বিস্মিত ও বিরক্ত হইলাম। সে ব্যক্তি একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া খুব সম্ভ্রমের সহিত আমায় অভিবাদন করিয়া কুণ্ঠিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, অদূরস্থ বাড়ীটাই 'থিসল্‌টনপ্রাসাদ' কিনা? আমি ঘাড় নাড়িয়া "হাঁ" বলিতেই তিনি পুনশ্চ আমায় বিনীত অভিবাদন করিয়া, ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি অপরিচিত পর্য্যাটককে দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম। ইঁহাকে যেন আমি কখন দেখিয়াছি—যেন ইনি আমার খুব বেশীই পরিচিত! অথচ মোটেই তাহা নয়।

"একটু পরে নূতন পোষাকে, অলঙ্কারে, পুষ্পে ও পুষ্পসারে সাজিয়া বিকশিত সুবাসিত কুসুমের ন্যায় আমার দর্পণস্থ পরিচিত প্রতিবিম্বকে পর্য্যন্ত যেন বিস্মিত করিয়া দিয়া মাসীমার উদ্দেশ্যে গেলাম। বড় ঘর সেদিন তখনও সাজান চলিতেছিল;—নাচের জন্য নৃত্যাগারটাকে একেবারে আগাগোড়া নূতন করিয়া তোলা হইয়াছিল। সেদিনকার উৎসবে মাসীমার সমস্ত বন্ধু-বান্ধবদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। নিজেকে এই অপূর্ব্ব সমারোহের একমাত্র নায়িকা-বোধে আমার মনে সেদিন যে একটু আনন্দ মিশ্রিত গর্ব্বেরও উদয় হয় নাই, তাহা বলিতে গেলে হয়ত মিথ্যাকথা বলা হয়! মাসীমার বসিবার ঘরে অবশেষে তাঁহার সাড়া পাইলাম। প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াও তাঁহার উত্তেজিত কণ্ঠ-স্বরে বাধা পাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলাম! শুনিলাম তিনি বলিতেছেন,—"আশ্চর্য্য হয়েছি! ক্রমাগত লিখে লিখে তোমায় আন্‌তে পারেনি,—অবশেষে তুমি আফ্রিকা চ'লে যাচ্চো জান্‌তে পেরে টেলিগ্রাম ক'রে তবে তোমায় আনাতে হয়েচে,—আর তুমি বল্‌চো কিনা 'সাতটার ট্রেণ ধর্‌তে না পার্‌লে তোমার অত্যন্ত ক্ষতি হবে'! আমি আশ্চর্য্য

হয়েছি! এ' কি রকম লোকের হাতে আমি মেয়ে দোব? যদি তুমি তাকে বিয়ে কর্‌তে অনিচ্ছুক থাক তা সে কথাও স্পষ্টই কেন বল না?"

"এ কাহার সহিত মাসীমার কথা হইতেছে? আমার বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডটা এমন জোরে আছড়াইয়া পড়িতে লাগিল যে, নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত সে উত্তেজনার আনন্দে আটকাইয়া আসিতে লাগিল,—এমন সময় শুনিলাম, তিরস্কৃত লোকটি বলিতেছেন, "আপনি আমার মা, সন্তান দোষী হ'লেও মা তাকে শতবার ক্ষমা কর্‌তে পারেন, এত দিন যদি ক্ষমা করেছেন, তখন আরও কিছুদিন করুন, এখন আমার মন একেবারেই সুস্থ নাই।"

"তাঁহার কণ্ঠে বেদনা ও কাতরতা যেন ঝঙ্কার করিয়া উঠিতেছিল। আমার বড় দুঃখ হইল। মাসীমা কেন তাঁহাকে আমার জন্য ভর্ৎসনা করিতেছেন? নাইবা তিনি আজ থাকিতে পারিলেন!

"মাসীমা উত্তেজিত স্বরেই বলিলেন, "ক্ষমা আমি শতবার কেন, সহস্রবারও করিতে পারি; কিন্তু কথা এই যে, এখন ড্যালি বড় হচ্চে, তোমার সঙ্গে তার সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ হওয়া তো উচিত। নইলে তার স্বাধীন ইচ্ছায় আমিতো আর চিরকাল চৌকি দিয়ে বেড়াতে পার্‌বো না! এখুনি তো আর আমি বিয়ে তোমায় কর্‌তে বলচিনে, কিন্তু তার আগে তোমার তো এখানে মধ্যে মধ্যে এক আধবার আসা যাওয়াও চাই।"

"গোপনে কাহারও কথা শোনা উচিত নয় জানিতাম, চলিয়া যাইব স্থিরও করিয়াছিলাম, কিন্তু তথাপি একটা অনিবার্য্য কৌতূহল রোধ করিতে না পারিয়া এ অন্যায়টুকুর লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তিনি কি উত্তর দেন, শুনিতে অত্যন্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু

উত্তর শুনিয়া খুবই চমৎকার লাগিল না, বরং মাসীমার এত কষ্ট করিয়া এমন সুস্পষ্ট বিশ্লেষণের পরে সেই কুণ্ঠিত-বিষাদপূর্ণ স্বরে সেই সংক্ষিপ্ত 'আমি চেষ্টা করবো' কথাটা আমার সেদিনকার সমস্ত সৌন্দর্য্য ও অভিমানকে এক মুহূর্ত্তেই আহত করিয়া ফেলিল! "চেষ্টা করবেন!" তিনি কি তবে আমার উপর আমারই মত আগ্রহ রাখেন না? আমিই ভিখারিণী তাঁহার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি! তাঁহার কাছে ভিক্ষা করিয়া তবেই হয়ত কিছু পাইব! আমার জন্য সঞ্চয় ভাণ্ডারে ভরা নাই! কেন, আমারই বা তবে দরকার কি? কিন্তু মুহূর্ত্তে সেই শ্রান্ত পর্য্যটকের অসামান্য সুন্দর মূর্ত্তি মনে পড়িল। আমার সেই ছবিখানাকে মনে পড়িল।—প্রতিশোধ-প্রবৃত্তিকে পরাজিত করিয়া প্রেমেরই জয় ঘোষিত হইল! তিনি এখনও তো আমায় চোখে দেখেন নাই, দেখিলেও চেনেন না। তা এতে আমায় ভাল না বাসায় তাঁর এমন বেশি দোষ কি? মাসীমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া এতক্ষণে আমার মুখ লজ্জায় ঈষৎ লাল হইয়া উঠিল। তাঁহার সেই জয়ের হাসি মনে পড়িয়া আমারও এখন হাসি আসিল।—বুঝিলাম সেনাপতি অনর্থক সেনা প্রস্তুত করেন নাই!

"নিজের ঘরে গিয়া তৃষ্ণা-শুষ্ক কণ্ঠ আর্দ্র করিয়া লইয়া যে টুকু প্রসাধন স্থানচ্যুত হইয়াছিল ও যে টুকু হয় নাই, সে সমস্ত সযত্নে যথাযথ স্থানে স্থাপন করিলাম। বাম হাতের মধ্যমা অঙ্গুলিতে একটি চুণির আংটি পরিলাম। তারপর বড় ঘরে নিমন্ত্রিতগণের অপেক্ষায় প্রবেশ করিলাম। মনটা এখন খুব বেশী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, বিলম্ব অসহ্য বোধ হইলেও তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা আরও অধিকতর অসহ্য হইয়াছিল, কেবলই চোখের পাতা আপনাআপনি নত হইয়া পড়িতে-

ছিল এবং বুকের মধ্যে অসম্ভব দ্রুত-তালে হৃৎপিণ্ডটা নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছিল। আপনাকে সংবরণ করিয়া লইবার জন্য—অন্যমনা হইবার আশায় একটা পূর্ব্বশ্রুত সঙ্গীতের একটি চরণ মৃদু মৃদু আপনার মনে গাহিতে গাহিতে একখানা আসনের দিকে অগ্রসর হইলাম। আমার এই সঙ্গীতের ক্ষুদ্র চরণ টুকু ফিরিয়া ফিরিয়া আমারই কাণে অন্যের কণ্ঠস্বর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। গলা এত কাঁপিতেছিল যে, আমার ভয় হইল, কি করিয়া আজ আমি অভ্যাগতগণের নিকট নিজের মান মর্য্যাদা রক্ষা করিব? একি—আনন্দে আমাকে এমন শক্তিহীন করিল কেন?

"কি আশ্চর্য্য! ঘরে যে অন্য এক ব্যক্তি জানালার নিকট দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাও এতক্ষণ কি দেখিতে পাই নাই! আনন্দে আমি অন্ধ হইয়াছিলাম নাকি? ইনিই তো সেই নূতন অতিথি,—নবীন পর্য্যাটক—এবং আর—কে? তিনি গভীর বিস্ময়ে আমার পানে চাহিয়া আছেন দেখিয়া আমি ঘোর লজ্জায় আরক্ত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। ছি,—ছি, তিনি যদি মনে করেন সত্য সত্যই আমি নির্লজ্জের মত তাঁহাকে তাড়াতাড়ি দেখা দিতে আসিয়াছি!—কিন্তু বেশীক্ষণ আমায় এ সঙ্কটে থাকিতে হইল না। তিনি নিজের বিস্ময় দমন করিয়া কৌচখানা ঘুরিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হাত বাড়াইয়া দিয়া সসম্ভ্রমে কহিলেন, "নমস্কার"—একটু ম্লান হাসির সহিত কহিলেন,—"আমি আপনাকে বোধ হয় এখন কুমারী ম্যানিং ব'লে সম্বোধন করতে পারি! পূর্ব্বে চিনতুম না, সেজন্য যে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে ক্ষমা করবেন।"

"আমি আনন্দে লজ্জায় বিস্ময়ে জড়ীভূত ভাবে শুধু ঘাড়

নাড়িলাম। এমনই করিয়া আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ ও প্রথম পরিচয় সাধিত হইয়া গেল। যে অলক্ষ্য হস্ত আমাদের সকল কার্য্যকে সকল অবস্থার মধ্য দিয়া পরিচালিত করিয়া থাকেন, তাঁহার সেই মঙ্গল হস্ত ভিন্ন সেখানে আর কাহারও সাহায্য আবশ্যক ছিল না। আমরা দু'জনেই অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বিপন্নভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমি নিজেকে জয়ী বোধ করিয়া নিজের অন্তরের মধ্যে একটা পুলক-কম্পন অনুভব করিতে লাগিলাম। তিনি কি ভাবিতে-ছিলেন,—জানি না। দু'একবার যে আমার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, তাহা আমি নতমুখে থাকিয়াও বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমার সৌন্দর্য্য, আমার জীবন, আমার সযত্ন-রচিত সজ্জা সমস্তই আজ আমার সার্থক মনে হইল!

"তারপর মাসীমা আসিয়া পড়িলেন। তিনি আমাদের দু'জনকে এক সঙ্গে দেখিয়া প্রথমে যেন খুব বিস্মিত হইয়াছিলেন, তারপর আমাদের ভাব দেখিয়া হাসিয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"গেব্রিয়েল এই আমার বোন্‌ঝি মিস্ ম্যানিং; ভায়োলা, ইনিই মিঃ ব্রাউন।"

"তিনি মৃদু-গম্ভীর স্বরে অথচ ঈষৎ হাসির সহিত উত্তর দিলেন—"আমি ঘরের ছবি থেকে এঁকে চিন্‌তে পেরেচি, তা ছাড়া আস্‌বার সময় নদীতীরে মিস্ ম্যানিংএর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, ওঁকেই তো আমি 'থিসল্‌টনপ্রাসাদের' কথা জিজ্ঞাসা করি।' মাসীমা সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন,—"ও-তবে তো তোমাদের মধ্যে বেশ নভেলিয়ানাও হ'য়ে গ্যাছে। তা গেব্রিয়েল, তুমি আমাদের বাড়ী পর্য্যন্ত ভুলে গেছ?" তিনি অত্যন্ত অপরাধীর মত মাথা নীচু করিলেন,—বিজড়িত ভাবে কহিলেন, "হ্যাঁ আমি এক রকম ভুলেই গেছি বই কি, খুব ছোট বেলা

ভিন্ন আর আমার এখানে আসা হ'য়ে ওঠেনিতো।" মাসীমা বলিলেন, —"আচ্ছা যা হয়েছে তা যাক্, এখন থেকে যেন সর্ব্বদা 'আসা হ'য়ে উঠে,' কি বলো ভ্যালি, আমরা এখন থেকে খুব আগ্রহের সঙ্গেই আমাদের গেব্রিয়েলের প্রতীক্ষা কর্‌বো—কেমন না?"

"আমি আরও লাল হইয়া উঠিয়া চক্ষু নত করিলাম,—শুনিতে পাইলাম তিনি গভীর বিষাদে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তেমনই নিরুদ্যম মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন—'আমি খুব চেষ্টা কর্‌বো।'

"মুহূর্ত্তে আমার কল্পনা-কানন তীব্র তাপে শুকাইয়া উঠিল, দারুণ আঘাতে হৃদ্‌পিণ্ড যেন স্তব্ধ হইয়া গেল, সেই মুহূর্ত্তে উঠিয়া চলিয়া যাইতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু আমাকে আর যাইতে হইল না। সেই মুহূর্ত্তে তিনিই ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মাসীমার পানে চাহিয়া বিনয়ের সহিত কহিলেন, "আজ তবে চল্লুম, আপনাদের দু'জনের কাছেই বিদায়।"

"ওগো আলোকময়ি পৃথিবি! তুমি এই মুহূর্ত্তে ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া যাও! কিরণদীপ্ত তরুণ সূর্য্য! তুমি আমার এ অপমান দাঁড়াইয়া দেখিও না! মাসীমার উপর তখন অত্যন্ত ক্রোধ হইল,—ইচ্ছা হইল সমস্ত চুণি মুক্তা ও সাটিন কঠোর হস্তে টানিয়া ছিন্ন করিয়া ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া মাটির ভিতর মুখ লুকাইয়া [illegible]! আমি কি সৌন্দর্য্যের জাল পাতিয়া এই আমার প্রতি একান্ত বিমুখ, চপল হরিণ ধরিতে আসিয়াছিলাম? সেদিনকার সমস্ত সঙ্গীত, সমুদয় আলোক ও সমস্ত আনন্দালাপ আমার নিকট তিক্তস্বাদ হইয়া গেল।"

৪

কুমারী গ্রেস্ অনেকক্ষণ থামিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, —"সেবারে স্কুলে ফিরিয়া গিয়া কিছুদিনের মধ্যে আমার একজন পুরাতন প্রিয় সঙ্গিনীকে ফিরিয়া পাইলাম, সে একটি অনাথা বালিকা তার নাম 'মিস্ গর্ডন', মিস্ গর্ডনের খৃষ্টান নাম ছিল শার্লট্ কিন্তু আমরা তাহাকে লোটি বলিয়া ডাকিতাম।

"লোটি আমাদের কাছে অপরিচিতা নয় পূর্ব্বে অনেক দিনই আমরা এখানে এক সঙ্গে ছিলাম, সেই সময়ে সে আমার সঙ্গে পড়িত। তখন আমাদের মধ্যে অত্যন্ত বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। তারপর আমার বয়স যখন বার বৎসর এবং লোটির চৌদ্দ, তখন সে এখান হইতে চলিয়া যায়। শুনিয়াছিলাম, তাহার মা মারা গিয়াছেন, বৃদ্ধ পিতার সেবা এবং শিশু ভাই বোনগুলির পালনের জন্য দরিদ্র পাদরি কন্যাকে এবার হইতে নিজের নিকটেই রাখিবেন। লোটি চলিয়া গেলে কিছুদিন আমার সমস্তই যেন শূন্যময় হইয়া গিয়াছিল, কিছুই যেন ভাল লাগিত না; তারপর আবার সংসারের নিয়মে সে বিরহ-ব্যথা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল।

"এবারে গভীর বিশ্বাসের উপর যেন একটা আকস্মিক নিদারুণ আঘাত পাইয়া নারীত্বের ক্ষুব্ধ গর্ব্ব ও রমণীর স্বভাবজ লজ্জাভিমান আমার ব্যথিত হৃদয়কে যখন গোপনে অত্যন্ত পীড়ন করিতেছিল, অথচ একথা লইয়া জগতে একটি প্রাণীরও নিকটে আলোচনা করিবার উপায় টুকুও ছিল না, এমন কি মাসীমা শুদ্ধ যখন এবিষয়ে আমায় একটি মাত্র সান্ত্বনার কথা না বলিয়া বরং উল্টিয়া পাল্টিয়া তাঁহার সুদীর্ঘ

সুঠাম দেহের,—তাঁহার আয়ত উজ্জ্বল নেত্রের এবং বিনীত ব্যবহারেরই উল্লেখ করিতে লাগিলেন ;—সেই সময় আমার এই পূর্ব্ব-স্নেহের সঙ্গিনীকে পাইয়া আমি যেন কতকটা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। কিন্তু তাহাকে পাইয়া যাহা আমি বড় আশা করিয়াছিলাম দেখিলাম, তাহা আর হইবার নয়। লোটি আর সে লোটি নাই। তাহাকে কাছে পাইয়া আমি আমার বেদনা দু' দিনেই অনেকখানি ভুলিয়া আসিলাম, কিন্তু সে যে এবার তীব্র ব্যথা বক্ষে বহিয়া আসিয়াছিল, তাহার সে সুগভীর আঘাত-ক্ষত শুকাইল না। মাতৃহীনা লোটি সম্প্রতি সংসারের একমাত্র ভরসা পিতাকে হারাইয়া আসিয়াছে। অনাথা লোটি দাদার অগষ্টাইনকে নিজেকের অবস্থা জানাইয়া পত্র লিখিয়াছিল, তিনি তাহাদের তিনটি ভাই বোনকে তাই সস্নেহে গ্রহণ করিয়াছেন। সেই যে লোটির শুভ্র ললাটে বিষাদের কালিমা ঘনীভূত হইয়াছিল, আমাদের শত চেষ্টাতেও তাহা আর মুছা গেল না। সে স্বভাবতই খুব ধীরস্বভাবা এবং ধৈর্য্যশীলা ছিল ; আজ কাল আর যেন তাহার ছায়ার মত ক্ষীণ, মার্ব্বেলের মত শুভ্র, দলিত পুষ্পটির মতই পরিম্লান অঙ্গে জীবনী-শক্তির সঞ্চার আছে কি না তাহা খুঁজিয়া দেখিতে হইত। আমার চোখ ফাটিয়া কেবলই জল আসিত! আহা কি লোটি— হইল! প্রাণপণে তাহাকে সান্ত্বনা দিতাম। নিজের পড়া শোনা ভুলিয়া গিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিতাম। মধ্যে মধ্যে তাহার গলা ধরিয়া চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিতাম,—"লোটি কি করলে তুই সুখী হোস্ ভাই বল না, আমি প্রাণ দিয়েও তা করবো।"

"লোটি স্নেহের হাসি হাসিয়া আমার মাথাটা কোলে টানিয়া

লইয়া চুম্বন করিত,—গভীর নিরাশার হাসি হাসিয়া বলিত—"অসম্ভব —সে অসম্ভব! ভ্যালি! সে কথা যেতে দাও।"

তারপর অনেকদিন পরে—প্রায় বৎসরাধিক পরে একদিন সে আমায় তাহার এই দুঃখ, নিরাশার কারণ জানাইল। শুনিলাম,—সে একজনকে ভালবাসিয়াছিল এবং প্রতিদানও পাইয়াছিল।—শুনিয়া আমার হৃদয়ের তুফান আবার যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তবে আবার তাহার দুঃখ কি? ভালবাসিয়া যদি প্রতিদান পাওয়া গেল, তাহার পরেও আর কি চাই? কিন্তু বোধ করি, লোটির সর্ব্বহারাচিত্ত এতটা স্বার্থহীন হইতে ইচ্ছুক ছিল না। সে তাহার ভালবাসার এই প্রতিদান পাইয়াই অধিকতর লুব্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, কিংবা মানব-ধর্ম্ম প্রণোদিত হইয়া জানি না, অশরীরী এবং শরীরী দুইটি পদার্থের উপরই সে নাকি বড় আশাই করিয়া বসিয়াছিল। অবশ্য এ আশার মন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন,—তাহারই প্রণয়ী। লোটির মুখে শুনিলাম, তাহার প্রণয়ী তাহাকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসিতেন,—বাসিতেনই বা কেন—এখনও তিনি নাকি তাহাকে তেমনই অকৃত্রিম ভালবাসেন এবং প্রতিজ্ঞা আছে, চিরদিনই তেমনই বাসিবেন! কিন্তু এ জন্মে আর একটিবারও তাহাদের সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। 'কেন?' তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াও তাহার নিকট হইতে উত্তর পাই নাই, শুধু একটা মর্ম্মভেদী রোদনোচ্ছ্বাসে আমার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। আহা, বেচারা লোটি! নিশ্চয়ই হৃদয়হীন কালের কঠোর হস্ত তাহার সুকোমল হৃদয়খানিকে দলিত করিয়া ফেলিয়াছে! বেদনায় আমার মুখে সান্ত্বনা বাক্য মিলাইয়া গেল।

তারপর আরও একটি ছয়মাস অতীত হইয়া গিয়াছে।

এখন আর আমি 'কনভেণ্টে'র ছাত্রী নই। প্রায় ছয় মাস হইতে চলিল, আমি বাড়ী আসিয়াছি। লোটি আর কোথায় যাইবে, সে তাহার চির নিরানন্দ জীবন সেই উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত ক্ষুদ্র জগতের মাঝখানেই নিবদ্ধ রাখিয়া মরণের প্রতীক্ষা করিতেছিল। অনেক কষ্টে আমি জানিয়া লইয়াছিলাম, তাহার মানস স্বামী এ জগৎ হইতে অপসৃত নহেন। দরিদ্র যুবকের লুব্ধ পিতা মৃত্যুকালীন তাহাকে এক ধনী কন্যার সহিত বিবাহে কঠোর শপথ করাইয়াছেন, তাহারই ফলে তাহারা পরস্পর হইতে বিছিন্ন। লোটির প্রধান দুঃখ এই যে, সে বিবাহে তিনি নিজেও কিছুমাত্র সুখী হইতে পারিবেন না। কারণ সে ভালরূপেই জানে যে তাঁহার চিত্ত লোটির নিকটেই সম্পূর্ণরূপে বিক্রীত।

"ইতিমধ্যে মাসীমার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে তিনি আমার বিবাহের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। আফ্রিকার যে যুদ্ধে মিঃ ব্রাউন দেড় বৎসর পূর্ব্বে গিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদেরই জয় হইয়াছিল মেজর ব্রাউন এখন কর্ণেল ব্রাউন রূপে সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। এবার আফ্রিকার ফেরত তিনি আমাদের বাড়ীতে আপনিই আসিয়াছিলেন। পূর্ব্ব-কথা স্মরণ করিয়া মাসীমার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে ও ভৎর্সনায়ও আমি নিজের বেশ-ভূষার প্রতি মনোযোগ দিতে পারি নাই। কিন্তু আমার সহস্র চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ললাট ও কপোল যে অস্বাভাবিক রক্তিমার দ্বারা আনন্দ চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া উঠিতেছিল, ইহাকে কেমন করিয়া বাধা দিব?

"আমাদের দ্বিতীয় মিলন প্রথম পরিচয়ের অপরিসীম লজ্জার স্মৃতিতে আমার কাছে যতখানি নিরানন্দকর হইয়া উঠিয়াছিল,

সামান্য ক্ষণের কথাবার্ত্তায় সেটুকু মুছিয়া গিয়া তাঁহার স্থানে যে আনন্দ, যে আশা বুকে বহিয়া নিজের ঘরে ফিরিলাম, তাহার একটুখানি কণা মাত্র আমার আনন্দহীনা সঙ্গিনী লোটির নিরানন্দ মুখকেও আলোকিত করিয়াছিল। সূর্য্যের আলো যে মেঘের ও রাত্রের সমুদয় অন্ধকারকেই মুহূর্ত্তে দূরীভূত করিয়া দেয়। লোটি তখন আমারই গৃহে অতিথি। তাহাকে চুম্বন করিয়া তাহার গলা জড়াইয়া বলিলাম—"কি ভুল বুঝেছিলুম লোটি, তিনি এত স্নেহময়! তাঁকে কত নিষ্ঠুরই যে আমি না জেনে বুঝে ভেবেছি!" লোটি ম্লান মুখে হাসিয়া কহিল,—"স্নেহ, প্রেম যে পরস্পরকে আকর্ষণ করে। ভ্যালি, তোমার প্রেমাস্পদ এবার তবে প্রকৃতিস্থ হয়েছেন?" প্রকৃতিস্থ? তিনি তখন তবে বাস্তবিকই অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন! আর স্বার্থপরায়ণা অভিমানে জ্ঞানহীনা আমি না বুঝিয়া না জানিয়া অনর্থক চিন্তানলে দগ্ধ হইয়া পলে পলে মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করিতে করিতে বুকফাটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবিতেছিলাম, 'আমি কি দুর্ভাগিনী! লোটি প্রকৃত প্রেম কাহাকে বলে তাহা জানে; তাই সে তাঁহার অবস্থা এত সহজে বুঝিতে পারিল। ছি ছি এমন হৃদয়হীনা আমি—আমি তাঁহাকে,—আমার জীবন-সর্ব্বস্বকে, চিনিলাম না!' লজ্জায় লোটির বুকে মুখ লুকাইয়া অস্ফুট জড়িত কণ্ঠে বলিলাম,—"ঠিক কথা লোটি, ঠিক কথাই তুমি বলেছ। সেই সময় তাঁর বাপ মারা যান, তাইতে তাঁদের বৃহৎ সংসারে তখন দারিদ্র্যের বিভীষিকাপূর্ণ কঠোর হস্ত পতিত হয়েছিল। আমি তাঁকে চিনিনি লোটি, তাঁর সেই গভীর বেদনাভরা দৃষ্টিতেও আমার অভিমান চূর্ণ হয়নি। আহা গেব্রিয়েল! যে তোমার সুখ

দুঃখ বোঝে না এমন পাষাণীকেও তোমার সুখ দুঃখের চিরসঙ্গিনী করতে হবে।"

লোটি চমকিয়া আমায় তাহার বাহু-বেষ্টন হইতে ছাড়িয়া দিল। আমার কপালের উপর খুব বড় বড় নিঃশ্বাসের বাতাস মুহূর্ত্তে অনুভব করিয়া আমি বিস্ময়ের সঙ্গে মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিলাম;—একি! মৃগী রোগীর মত তাহার এ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের হেতু কি? লোটির শুভ্র কপোলের সমুদয় রক্তাভা নিঃশেষ হইয়া মুছিয়া গিয়াছিল। তাহার রক্তহীন পাংশু অধর থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, সভয়ে উঠিয়া বসিয়া তাহার কম্পিত হাত দু' খানা দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া ভীতকণ্ঠে ডাকিলাম, "লোটি, কি হ'ল? এ কি হ'ল।" সেই রক্তহীন মুখের বিবর্ণ ওষ্ঠে বিষাদের হাসি কি ভয়ানক বিবর্ণ ও ম্লান দেখাইল! লোটি যেন কি এক সর্ব্বনাশ প্রচ্ছন্ন হাসি হাসিয়া বলিল—"কিছু হয়নি ভ্যালি, তোমার বাগ্‌দত্ত স্বামীর নামই কি গৈব্রিয়েল? * * ডেন্‌সলির ডাক্তার ব্রাউনের ছেলে কি তিনি?"

"নিশ্চয়ই লোটির হিষ্টিরিয়া আছে! জীবন্ত মানুষের মুখে এ রকম দুর্ব্বল অস্ফুট স্বর ও এ রকম হাসি ম্লান আর কখনও ইহার পূর্ব্বে শুনি নাই! সে তাঁহাকে তবে চেনে? এ কথাটা শুনিয়া আমার মনে খুব আনন্দ হইল। আজ তবে লোটিকে ছাড়া হইবে না; আমাদের নূতন সুখের সেও কিছু অংশ গ্রহণ করিলে নিজের দুঃখ কতকটা হয়ত তবু ভুলিতে পারিবে। বলিলাম,—"তবে তো খুব ভালই হ'ল। আমিও যে ভুলে গেছলুম, তিনি যে তোমারই দেশের লোক। আয়না ভাই তোদের তাহলে

আলাপ করিয়ে দি। তবে ভয় হয় লোটি, যদি তিনি তোকে দেখে আমায় আর না চেয়ে দেখেন। যদি.........”

“আমার এই সামান্য চপলতার এমন যে ফল হইবে, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই! আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই লোটি তড়িতাহতের মত এক মুহূর্ত্ত স্তম্ভিতভাবে চাহিয়া থাকিয়া পর মুহূর্ত্তে বিদ্যুতের মতই উঠিয়া চলিয়া গেল। লজ্জায় অনুশোচনায় আমি যেন মর্ম্মে মরিয়া গেলাম। লোটিকে কি এ সব তামাসা করিতে আছে। সে যে নিজের প্রিয়র ধ্যানেই তন্ময়!

“কর্ণেল ব্রাউন এবার সর্ব্বদাই মাসীমার কাছে কাছে থাকেন, আমাকেও দিনের অধিকাংশ সময় তাঁহার রোগ-শয্যার পার্শ্বেই কাটাইতে হয়। মাসীমা তাঁহার স্নেহ-ব্যাকুল দুই স্তিমিত নেত্রে যখন আমাদের পানে চাহিয়া থাকেন, তখন তাহার মধ্য হইতে এমন দুইটি নির্ম্মল প্রীতিপূর্ণ আশীর্ব্বাদের ধারা নীরব-আনন্দে আমাদের মস্তকের উপরে বর্ষিত হইতে থাকে, তাহাতে মনে হইত যে, আমার ভবিষ্যতের দিকটা আমার কাছে যেন সমধিক উজ্জ্বল ও নির্ম্মল হইয়া উঠিতে লাগিল। মাসীমাকেও এবার আমার জন্য সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত দেখিলাম। আমরা অধীর,—একটু খানি বিলম্বও আমাদের সহে না। তাই আমরা এত দুঃখ পাই। শুধু একটুখানি ধৈর্য্য রাখিলেই দেখা যায় যাহা আমাদের কাছে দুঃখরূপে দেখা দিয়াছিল তাহাই তাহার প্রকৃতরূপ নহে।

“সেই দিনই লোটি চলিয়া গিয়াছিল। তাহাকে একদিন দেখিতে গেলাম,—গিয়া দেখিলাম, লোটির শরীর ভারী অসুস্থ কিন্তু বেশ বুঝিলাম শরীরের অপেক্ষা তার মনের অশান্তিই যেন শতগুণ

বেশী। আহা, কেন মানুষের স্বার্থপর হস্ত তাহাদের মধ্যে প্রসারিত হইয়া আজ তাহার এ শোচনীয় অবস্থা ঘটাইল! তাহার প্রাণাধার, পিতার মৃত্যু-শয্যায় তাঁহার কাছে কেন এমন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে বাধ্য হইলেন, যে উভয়ের মধ্যে এত ভালবাসা সত্ত্বেও তাহাকে তিনি পত্নী-পদ দান করিবেন না! পিতৃভক্তির পদে হৃদয়কে বলিদান করিয়া তাই তিনি নাকি সুদীর্ঘকালের জন্যই দেশত্যাগী। এ জগতে আর তাহাদের সাক্ষাৎ হইবে না! লোটি তাই উৎসুকচিত্তে পরলোকের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। কি নিষ্ঠুরতা! কি কঠোর পিতৃআজ্ঞা! আহা অভাগিনী! মৃত্যুর অত্যাচার সহ্য করা ভিন্ন উপায় নাই। কিন্তু এ যে মানুষের স্বেচ্ছাকৃত নির্ম্মমতা তাই এ আঘাতও যেন অধিকতর অসহ্য!

"অনেক অনুরোধেও লোটি তাহার প্রেমাস্পদের নামটি আমায় বলিল না। চোখের জল মুছিয়া কেবল মাত্র বলিল,—"ও কথা ছেড়ে দাও ভ্যালি আমায় ও কথা জিজ্ঞাসা করো না।"

"এ প্রসঙ্গে সে যেন আজ অধিকতর অস্বস্থচিত্ত হইয়া উঠিতেছিল। যেন কথাটা চাপা দিতে পারিলেই সে বাঁচে।

"ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু কি একটা অস্পষ্ট সন্দেহের ছায়া অন্ধকার ভেদ করিয়া তীক্ষ্ণ তীব্র আলোকের ছুরিকার মত মনের ভিতর বিঁধিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। অনেক চেষ্টাতেও আর তাহাকে যেন চাপিয়া রাখা কঠিন হইতেছিল।"

৫

মানুষের জীবনে এমন এক একটা শুভ মুহূর্ত্ত আসে, যে সময় সে তাহার সমুদয় সুখ দুঃখ লাভ লোকসানের খতেন ভুলিয়া—এমন কি নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়া অন্যের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ-রূপে সঁপিয়া দিয়া বসে। তখন নিজেকে দূরে সরাইয়া ফেলিয়া অপরের জন্য কোন একটা কিছু কাজ, কোন একটা প্রবল আত্মবিসর্জ্জন না করিতে পাইয়া বুকের মধ্যে প্রাণটা যেন রুদ্ধদ্বার লোহার খাঁচায় টিয়া পাখীর চঞ্চুর আঘাতের মতই খোঁচা মারিতে থাকে। মনের মধ্যে যখন সেই আত্মত্যাগের স্রোতোময় উচ্ছ্বাস প্রবলতর হইয়া উঠিয়া তাহা তটের উপর আছড়াইয়া পড়িতে চাহে, তখন সে বারেক মনেও করে না যে সেই উচ্ছ্বাসের আবেগ তাহাকে সেই আঘাতে চূর্ণ করিয়া দিতেও পারে!

"লোটির সহিত সাক্ষাতের পর হইতে আমার মনে যে নূতন ভাবটা জাগিয়া উঠিয়াছিল, সেটাকে বুকে করিয়া লইয়া সেদিন সারা দিনটাই আমি অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম। জানালার বাহিরে মাসীমার বাগানে কোন্ সময় জানিতে পারি নাই, বসন্তের বুঝি শুভাগমন হইয়াছিল, ছোট নদীটি গ্রীষ্মের আগমন-বার্ত্তা ঘোষিত হইবার পূর্ব্বেই শীর্ণ হইয়া বালু-শয্যার উপরে অত্যন্ত স্বচ্ছতা লাভ করিয়া নিঃশব্দে বাহিত হইতেছে। সূর্য্যালোকে তাহার তলস্থ কম্পিত নুড়িগুলি ঝিক্ মিক্ করিতেছিল, বসন্তের বাতাস তাহার অঙ্গে পুলক-স্পন্দন আনিতেছিল, ও আকাশের প্রতিবিম্ব তাহার বক্ষে মৃদু আবেগের মত কম্পিত হইতেছিল। বইখানা মুড়িয়া জানালার নিকট দাঁড়াইয়া

একবার ভাল করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। নদীতীরে একটি পুরাতন ওক বৃক্ষ যুগ-যুগান্তরের সাক্ষীস্বরূপ নতমস্তকে দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার অবিরল শাখা প্রশাখার মধ্যে কোন একটি নীড়ে সদ্যঃ-প্রত্যাগত একটি পাখী মৃদু কাকলীতে সন্তানগুলির সহিত আলাপ করিতেছে। এ সমস্তই পুরাতন দৃশ্য, প্রায় প্রতিদিনই আমি ঐ নদী-তীরে ঐ বৃক্ষতলে ভ্রমণ করি অথবা এই জানালায় দাঁড়াইয়া ঐ শাখা-জালনিবদ্ধ তরু-শ্রেণী-তলে সূর্য্য কিরণের নিভৃত লুকোচুরি খেলা চাহিয়া দেখি। কিন্তু আজ এই ঘন পল্লবের মর্ম্মরিত দীর্ঘ নিঃশ্বাসে, সন্ধ্যার স্তব্ধ তন্ময়তায় এবং তরুতল-বিচ্যুত ঝরা ফুলের গন্ধের সহিত কোথা হইতে ভাসিয়া আসা; আর একটা মধুর মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনিতে সহসা আজ আমার জাগ্রৎ চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। একটা অজানা আনন্দে প্রাণের ভিতরটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। আনন্দে কি বেদনায় বলিতে পারি না, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সুরবাঁধা বেহালার তাঁতের মত আমার হৃদয়-তন্ত্রী কয়টা আপনা আপনি কোন এক অজ্ঞাত অঙ্গুলির স্পর্শ-সুখে বিহ্বল হইয়া বাজিতে লাগিল। প্রকৃতির মর্ম্মোচ্ছ্বাসময় আলিঙ্গনে নিঃশব্দে কণ্টকিতচিত্তে আপনাকে ক্ষণকালের জন্য ছাড়িয়া দিলাম, অন্তরের মধ্যে তাঁহারই মত উদার উন্মুক্ত অবাধ স্বাধীন ও তেমনিতর সর্ব্বত্র বন্ধন-সুখ অনুভব করিতে করিতে নতমস্তকে বলিলাম,—"তোমার মত আমিও তৃপ্ত করিতে চাই, —ধন্য হইতে চাই।" প্রকৃতির অদৃশ্য করাঙ্গুলি তাঁহার দক্ষিণা বাতাসের সমস্ত পুষ্প-পরিমল লইয়া তাঁহার স্নেহ-স্পর্শের করুণাকোমল দৃষ্টির মত আমার নবোচ্ছ্বাস-দীপ্ত মুখের উপর যেন জাগিয়া রহিল। বৃক্ষলতা হইতে প্রকাণ্ডকায় বৃক্ষ এবং পরস্পরের ছায়া-ঢাকা বন-বীথি সকলেই

মর্ম্মর তানে মাথা দুলাইয়া আশীর্ব্বাদচ্ছলে পত্র পুষ্প বর্ষণ করিয়া কহিল,—"তাই হও, তুমি আমাদেরই মত হও!"

"পুরস্কৃত বালিকা পুরস্কার বস্তুটিকে যেমন গর্ব্বিত আনন্দে বুকে চাপিয়া ধরিয়া পুরস্কার প্রদাত্রীকে মাথা নোয়াইয়া চলিয়া যায়, তেমনই করিয়া আমার পুরস্কার, আমার উচ্ছ্বাস, আমি বক্ষে সংযত করিয়া—মাথা নীচু করিয়া জগতের রাজরাজেশ্বরীকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিলাম। খুব একটা গুমোট কাটাইয়া স্নিগ্ধ সুবিমল বারি-ধারায় ধূসর ধূলিজাল ও নিদারুণ উত্তাপ ঘুচাইয়া ধরণী-বক্ষ শীতল করিয়া যখন বর্ষার বাতাস প্রথম বহিতে থাকে, তখন প্রকৃতির অঙ্গ যেমন নবীন স্নিগ্ধ শ্যামল শোভায় ভরিয়া উঠে, তাঁহার মুখে যেমন একটি পরিতৃপ্তির ভাব দেখা যায়, আমিও বোধ হয় সেই রকম একটি তৃপ্তি ও প্রীতি লাভ করিয়া সেদিন আগতপ্রায় সন্ধ্যায় আমাদের উদ্যানে ফিরিয়া আসিলাম।

"তখন বাতাস একটু এলোমেলো বহিতেছিল। আমার নীল আকাশের মত নীল রঙের পোষাকটা সেই দক্ষিণা বাতাসে বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কপালের উপর এবং কাণের পাশে কতকগুলো শ্লথ চূর্ণ কুন্তল বন্ধনমুক্ত হইয়া থাকিত, তাহারা এবং শৃঙ্খলমুক্ত হরিণ-শিশুর মত আর কয়েকটা গুচ্ছ সেই বাতাসে চোখে মুখে আসিয়া পড়িয়া চঞ্চল-ক্রীড়াচ্ছলে আমায় বিরক্ত করিয়া তুলিল। মনটা তখন খুব উচ্চ সুরেই বাঁধা ছিল। পৃথিবীর ক্ষুদ্র কামনা বাসনা সব আজ সকরুণ স্নেহে নিজের কাছ হইতে টানিয়া লইয়া পৃথিবীর মধ্যেই তাহাদের বিলাইয়া দিয়া নিঃস্ব হইয়া বসিবার জন্য প্রাণের মধ্যে যেন কেমন করিতে লাগিল।

"কিন্তু মধ্য পথেই আমার সুকুমার দিবা-স্বপ্ন সহসা একটি অতর্কিত কণ্ঠস্বরে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিল। সেই সময় বসন্তের দক্ষিণ বাতাস জগতের সমুদয় সার্থক কবিত্বের বিজয় সঙ্গীতের মতই হু হু করিয়া বহিয়া গেল। গাছ-ভরা উভেরিয়া ম্যাগ্নোলিয়ার গন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়া আমার চূর্ণালকগুলি চোখে মুখে আনিয়া ফেলিল! আমার মনোবীণা তাল কাটিয়া ফেলিয়া হঠাৎ থামিয়া গিয়া আবার নূতন রাগিণীর সুর বাঁধিতে আরম্ভ করিল। সেইখানেই নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইলাম।

৬

"সম্মুখেই লতাগৃহের কাচের দরজা খুলিয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে দুই ব্যক্তি এক সঙ্গে বাহির হইয়া আসিলেন। একজন শুধু আমার দিকে চাহিয়া বিনম্রমস্তকে নমস্কার করিয়া প্রতি নমস্কার পাইতে না পাইতেই উদ্যানের রাস্তা ধরিয়া বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন। অপর লোকটি একটুখানি হাসিয়া মাথাটা একটু-নীচু করিলেন, কিন্তু চলিয়া গেলেন না; বরং কাছে আসিয়া সহাস্যমুখে হাত বাড়াইয়া দিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথা গিয়েছিলে?" মুহূর্ত্তে আমার বক্ষের মধ্যে চলন্ত রক্ত-স্রোত থম্‌কিয়া থম্‌কিয়া বহিতে লাগিল। তাহার একটা উচ্ছ্বাস মুখের উপর যে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে কিছু সন্দেহ নাই। মনের সে বিশ্বাসঘাতকতায় ঈষৎ বিরক্ত হইয়া অথবা স্বাভাবিক লজ্জায়;—তাহা ঠিক বলিতে পারি না, আমার নেত্র-পল্লব সহসা আনত হইয়া আসিল, ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে তাঁহার প্রসারিত করে আমার হাতখানা ছাড়িয়া দিয়া মৃদুস্বরে কহিলাম,—"নদীর ধারে।" আমার হাত

খানা সস্নেহে স্পর্শ করিয়া—এক মুহূর্ত্ত নিজের হাতের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া তিনি ধীরে ধীরে তাহা পরিত্যাগ করিলেন। আমার চকিত নেত্রে তাঁহার আনন্দোদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল এক মুহূর্ত্তের জন্য একটি পুলকোচ্ছ্বাস আনিয়া দিল। কমনীয়তার সঙ্গে সুদৃঢ় হৃদয়-বৃত্তির একটি ছবি কে যেন এই মর্ম্মরিত লতা-কুঞ্জের পাশে অপরাহ্নের আলোকে আঁকিয়া দিয়া গিয়াছিল। আমার জীবনের যে অংশটা পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিবার জন্য এতখানি আগ্রহ, এতখানি অস্থিরতা জাগিয়া উঠিয়াছিল, মুহূর্ত্তে তাহা ঐ মুখের, ঐ হৃদয়-ভারাবনত সুগভীর দৃষ্টির তলে আকুল হইয়া পরিত্যাগভীত শিশুর মত দুই হাতে যেন আমাকে আঁকড়াইয়া ধরিল।

"তিনি বলিলেন,—"নদীতীর তোমার খুব ভাল লাগে, না ভ্যালি?" এই 'ভ্যালি' সম্বোধনটা আমার হৃদয়-বীণার একটা তারের উপর মৃদু মৃদু আঘাত করিতে লাগিল। সে আহত তন্ত্রীর মধুর রাগিণী আমার কাণের কাছে বারে বারেই বাজিয়া উঠিতে লাগিল। ইতঃপূর্ব্বে 'মিস্ ম্যানিং'এর পরিবর্ত্তিত সংস্করণ দাঁড়াইয়াছিল 'ভায়োলা'; আজ বন্ধন যখন শিথিল হইয়া খুলিয়া আসিয়াছে, এমন সময় এমন করিয়া বাঁধিবার এ চেষ্টা কেন? আমি মৌনসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া নত নেত্রযুগল তুলিয়া বলিলাম,—"আমার একটি অনুরোধ আছে—" কথাটা শেষ করিবার পূর্ব্বেই তিনি বাধা দিলেন—"যেখানে আদেশ করিলে চলে, সেখানে অনুরোধের প্রয়োজন?"

"আমি এ কথাটায় কাণ না দিয়া নিজের বক্তব্য শেষ করিলাম,—"অনুগ্রহ ক'রে যদি শোনেন তবে বলিতে সাহস পাই।" আমার ভবিষ্যৎ প্রভু সচকিতে একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখি-

অদূরস্থ কাষ্ঠাসনখানা নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"অনুগ্রহ ক'রে যদি কিছু আদেশ করো, ঐখানে ব'সেই সেটা শোনা যাক্ না, তোমার ভূমিকা দেখে মনে হচ্চে, দুই এক কথায় বক্তব্যটা শেষ হবে না, না?" আমিও তাহাই খুঁজিতেছিলাম—ঠিক মুখোমুখি দাঁড়াইয়া বলা কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকিতেছিল। বেঞ্চের উপর আসিয়া বসিলে তিনি অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বল্‌বে বলো।" বলিলাম,—"আগে বলুন আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করবেন—না?" তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা আমি স্বীকার করলুম। নিশ্চয়ই তুমি কিছু আমায় 'রক্' পাখীর ডিম বা তেমনই কিছু সৃষ্টিছাড়া জিনিষ খুঁজে আন্‌তে বল্‌বে না।"

"উপমার ধরণটায় আমার মুখে বোধ হয় একটু বিষাদের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বলিলাম,—"না সে রকম খেয়াল আমার হয়নি, আমি খুব সংক্ষেপেই বল্‌চি। আমার একটি বন্ধু আছে সে আমারই বয়সি—" বলিয়া একটু থামিয়া আমার শ্রোতার পানে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম, তিনি একটু ঝুঁকিয়া হাতে হাতে বদ্ধ করিয়া মনোযোগ দিবার ভাবে বসিয়াছেন। সেই দক্ষিণে এলোমেলো হাওয়া তাঁহারও প্রশস্ত ললাটের উপরে সংযত সুবিন্যস্ত কেশ-গুচ্ছের মধ্যে তাহার সরু সরু অঙ্গুলিগুলি প্রবেশ করাইয়া দিয়া, সযত্নে একটু একটু নাড়িতেছিল। পশ্চাতের 'অরোকেরিয়া'র ছায়া-বিচ্যুত সূর্য্যকিরণ তাঁহার মুখের উপর তাঁহারই মত কৌতূহলে চাহিয়া দেখিতেছিল। আমি বলিলাম,—"বুঝ্‌তেই পার্‌চেন সে স্ত্রীলোক,—সে ছোট বেলা থেকে আমার বন্ধু, আমি তাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসি।"

"এই কথার পরেই যে তাঁহার অধর-প্রান্ত একটা সকৌতুক

অবিশ্বাসের হাস্যে ঈষৎ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমার অগোচর রহিল না; মনের উচ্ছ্বাসটা যেন একটা অনাবশ্যক আঘাত প্রাপ্তে চারিদিক্ দিয়া আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। স্বর একটুখানি উচ্চ করিয়া,—দ্বিধা একটুখানি কাটাইয়া, বলিতে লাগিলাম,—"আমি তাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসি, সেও আমাকে ভালবাসে।" এই কথাটায় প্রমাণ করিতে চাহিলাম, তোমার হাসিটা তুমি ফিরাইয়া লও। স্ত্রীলোকের মধ্যে হৃদয়-বিনিময় জিনিষটাকে যে এমন উপহাসের সহিত সকরুণ কটাক্ষে চাহিয়া দেখিতেছ, সেটা তত ক্ষুদ্র জিনিষ নয়! কিন্তু তিনি কি বুঝিলেন জানি না; তাঁহার মুখে বেশ একটু রহস্যপূর্ণ করুণার হাসি ঈষৎ আগ্রহের সহিত ফুটিয়া রহিল মাত্র। তা' দেখিয়া আমার বড় রাগ হইল, একি অন্যায় অবিশ্বাস! ইনি বোধ হয় ভাবিতেছেন, আমি আজ বসন্তের উন্মাদ সঙ্গীতোচ্ছ্বাসে মুগ্ধ, পুষ্পের মদিরাময় সুবাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া এই নির্জ্জন উদ্যানের প্রান্তে বসিয়া একপাতা 'নভেল' শুনাইবার অদম্য লোভে তাঁহাকে এখানে সাধিয়া আনিয়াছি! কেমন করিয়া আমাদের সুপ্ত-প্রেম-নির্ঝরের ধারা তাঁহার সম্মুখে খুলিয়া দিব, তাহা হঠাৎ ভাবিয়া পাইলাম না। কিন্তু এ লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের জন্য মন পীড়িত হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রথম হইতে অবিশ্বাসের হাসি! তবে শেষ হইবে কিসে? এমন সময় তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"আচ্ছা, মানিলাম তুমি তাঁকে 'প্রাণের চেয়ে ভালবাস' তিনিও বাসেন। তার-পর এখন আমি কি করিব সেইটুকুই আমায় বলিয়া দাও?"

"স্বরটা ঈষৎ ব্যঙ্গের অথচ কি মধুর সে সুরটুকু! মনকে জোর করিয়া ফিরাইয়া আমি কহিলাম, "সে ভারি সুন্দরী। শুধু অনাথা এইটুকু তার খুঁত।" মিঃ ব্রাউন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"আমায়

তুমি এই কথায় কি আদেশ করচো? কুমারীটির জন্য একটি কুমারের যোগাড় করা? সে অত বড় সুন্দরীর পক্ষে আর এমন কি আশ্চর্য্য!"

"বাধা দিয়া আমি এবার অসঙ্কোচে এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিলাম, "তার নাম লোটি, পাদরী গর্ডনের মেয়ে সে। আপনি তাকে জানেন বোধ হয়?"

""আমি! আমি! তাকে! হাঁ চিনি বই কি,—ভায়োলা, চিন্‌তাম!" আমার বেশ মনে হইল তিনি এসব কথাগুলো যতক্ষণ বলিতে লাগিলেন, সমস্তক্ষণই তাঁহার মুখে একটা অতি তীব্র বেদনার ভাব স্পষ্ট জাগিয়া রহিল, গলাটাও সুস্পষ্ট কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। যেন আমি সেই মুহূর্ত্তে তাঁহাকে, তাঁহার অন্তঃস্থলের মধ্যে প্রচণ্ড একটা আঘাত করিয়াছি। তিনি হঠাৎ চুপ করিলেন, বেঞ্চের পিঠের উপরে একটু হেলিয়া বসিয়া একটুখানি নিঃশ্বাস ফেলিয়া আমার দিকে চাহিলেন। অতি কাতর বিষণ্ণ দৃষ্টি! আমি সঙ্কোচের সহিত বলিয়া ফেলিলাম,—"আমার অনুরোধ— আপনি নিজেই লোটিকে বিয়ে করেন। সে আপনাকে এখনও তেমনই ভালবাসে। আমি সব জানি।"

"আমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই তিনি চমকিয়া সোজা হইয়া বসিলেন, অস্ফুটবিস্ময়ে বেদনাবিদ্ধ আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,— "আমি? সে কি ক'রে হবে! সে কি কখনও হয়?" আমি মনের ভিতরে তাঁহার তরল বিদ্রূপের উচ্চ হাস্য মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কল্পনা করিতেছিলাম। তখনও মনের মধ্যে একটুখানি সন্দেহের ছায়া ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে এতখানি মনোদ্বেগ দেখিয়া একটু আশ্চর্য্যানুভব করিলাম, একটু সুখ কি দুঃখ, আশা কি নিরাশা, কে জানে কি একটা

একবারটি মাত্র বুকের কাছটাতে ধক্ করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তখনই জোর করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলাম,—"কেন হবে না? আপনি স্বাধীন, ইচ্ছা কর্‌লেই হয়; মাসীমাকে বলিব, 'আমার অনিচ্ছাতে এ বিয়ে ভেঙে গেল।' উইলের সর্ত্তেও এ-তে আপনার কিছু ক্ষতি হবে না।" তিনি যেন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন! হাতে-হাতে ঘর্ষণ করিয়া ঠোঁটে-ঠোঁটে চাপিয়া নিজেকে যেন কি একটা ঘোর প্রলোভনের হাত হইতে—কঠোর পরীক্ষা হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া রুদ্ধপ্রায়স্বরে কহিলেন,—"কেন ভ্যালি! আমায় কেন এখন প্রত্যাখ্যান কর্‌চো? আমি তোমার কাছে কি নূতন কোন অপরাধ ক'রেছি? বুঝিলাম, তুমি সবই শুনেছ, হয়ত এ ভালই হয়েছে। কিন্তু আমি তো তোমার 'পরে ইচ্ছা ক'রে কোন অন্যায় করি নাই! মনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ক'রে নিজেকে তোমার যোগ্য করতে চেষ্টাও তো যথাসাধ্য কর্‌ছি। হয় ত আমার এ স্নেহ, শ্রদ্ধা ভবিষ্যতে তোমায় কোনদিন অনুতপ্তও করতো না। বলো, আমি কি তোমার মনে কোনরূপে ব্যথা দিয়েছি? যদি দিয়ে থাকি বিশ্বাস করো স্বেচ্ছায় দিই-নি। আমি তাকে এখনও ভালবাসি একথা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু আমি তোমায়ও যথেষ্টরূপে স্নেহ করি, এবং তার চেয়েও অনেক বেশী শ্রদ্ধা করি।"

"আমি বলিলাম,—"ব্যথা কিছুই দেন নি।"

"তারপর আর কি বলিব তাহা ভুলিয়া গেলাম।

"সমস্ত দিন ধরিয়া এতক্ষণ নদীর কূলে বসিয়া বসিয়া বক্তব্যটিকে এমন প্রাঞ্জল ভাবে, এমন শোভনীয়-রূপে সাজাইয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু যে রকম আশা করিয়াছিলাম, ঠিক যে তেমনটি হইল না! তাই

আমার কল্পনা, আমার কাব্যও ম্লান হইয়া গেল। ইহার চেয়ে তিনি যদি আমার এই মহত্ত্ব, এই আত্মত্যাগকে ছেলেখেলা বলিয়া মুখেও অন্ততঃ একবার হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিতেন, তাহা হইলেও বোধ করি আমার সাধের কল্পনা এমন করিয়া শুকাইয়া উঠিতে চাহিত না। হৃদয়ের বল মুহূর্ত্তেই ফুরাইয়া গিয়া ... করিয়া বুক ফাটিয়া হাহাকার বাহির হইয়া আসিত না। কিন্তু ... আর উপায় নাই। আমার সন্দেহই সত্য! আমার আশা স্বপ্ন ...! আমার জীবনসর্ব্বস্ব অন্যাসক্ত! তিনি আমার প্রতি "স্নেহস... হইলেও মনের মধ্যে তিনি তো আমার নহেন! হায় স্বার্থ-পরি... মানবী!"

আংটি।

স্বাস্থ্যলাভের আশায় আমি সমুদ্রতীরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, কিন্তু সেথান হইতে এক অ-স্বস্তি লইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

বেড়াইতে বেড়াইতে সাগর-কূলের বালুকারাশির মধ্য হইতে ঝিনুক সংগ্রহ করা একটা সখের কাজ জুটিয়াছিল। সেই উপলক্ষে প্রতিদিন যেমন ছড়িদিয়া বালুকার স্তর লইয়া নাড়া চাড়া করিয়া থাকি, সে দিনও সেই রকম করিতে করিতে একটা হীরার আংটি কুড়াইয়া পাইলাম।—আংটিটা গিনি সোণা বা তাহার কিছু কম দরের সোণায় প্রস্তুত।—সচরাচর বাজারে এরকম সোণার আংটি বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত থাকে না, ফরমাইস দিয়া গড়াইতে হয়। আংটিটার মাঝখানে একখানি বড় কমল হীরা। বালুকা লাগিয়াছিল, ভাল করিয়া ধুইতেই হীরাখানা মেঘমুক্ত নক্ষত্রের মত ঝকিয়া উঠিল।—বেশ দামী হীরা, ওজনে এক রতির উপর হইবে। হীরার কাটটার মধ্যেও বেশ একটু নিপুণতার চিহ্ন ছিল এবং এই টুকুই এই কুড়ান জহরতটির বিশেষত্ব। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে, হীরাখানাকে ছোট একটি ফুলের মতন দেখাইত।

বাড়ী আসিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম। —আংটির বর্ণনাটা দিলাম না, শুধু এইটুকু মাত্র লিখিলাম—

"...সমুদ্র তটে একটি আংটি কুড়াইয়া পাইয়াছি। আংটির বিবরণ সহ এই ঠিকানায় পত্র লিখুন। প্রকৃত অধিকারীকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র"।

প্রথম সপ্তাহে আমার বিজ্ঞাপনের উত্তর আসিল না। কোন লোকই আংটিটার দাবী করিতে আসিল না, কেহ পত্রও লিখিল না। ভাল মুস্কিলেই পড়া গেল! পরের জিনিষ, ইহা লইয়া আমি এখন করি কি? দামী জিনিষ, ফেলিয়া দেওয়া উচিত নয়, কাছে রাখা আরও অনুচিত। তবে কি কোন দাতব্য কার্য্যে পাঠাইয়া দিব? হাঁ, এই পরামর্শই ঠিক! সবিশেষ লিখিয়া আংটিটা মুড়িয়া শীল করিয়া একটি সৎকর্ম্ম ভাণ্ডারেই পাঠাইয়া দিই! অভাবগ্রস্তগণেরও কিছু উপকার হইবে এবং আমিও পরের বোঝা ঘাড় হইতে ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিব।

আংটিটা ছোট একটি টিনের কৌটায় পূরিয়া কোথায় পাঠাইব ভাবিতে গিয়াই সর্ব্ব প্রথমে 'রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে'র কথা মনে হইল। এমনধারা সদনুষ্ঠান এদেশে আর কিছুই নাই। লেবেলের উপর ঠিকানাটি লিখিতেছি এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া ডাকযোগে আগত দুই খানি পোষ্টকার্ড দিয়া গেল। হাতের কাজটুকু শুভকর্ম্ম বলিয়া প্রথমে তাহা শেষ করিলাম। শীল্ করা হইয়া গেলে, বাতিটা নিবাইয়া দিয়া একখানি কার্ড তুলিয়া পাঠ করিলাম, তাহাতে এইরূপ লেখা।—

"মহাশয় অতি সজ্জন! একালে এরূপ ধার্ম্মিক ব্যক্তি প্রায় চক্ষে পড়ে না। দুই মাস গত হইল, আমার অঙ্গুরীয়টি স্নানের সময়—সমুদ্রজলে পতিত হয়। ইহা নিশ্চয়ই সেই অঙ্গুরীয়। অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত ঠিকানায় মদীয় ভবনে উহা প্রেরণ পূর্ব্বক চি[রবাধিত] বাধিত করুন।"

স্বাক্ষর ছিল "চারুচন্দ্র কর্ম্মকার।" দ্বিতীয় পত্রও প্রায় এ[ই] প্রকার। বেশীর ভাগ তাহাতে এইটুকু ছিল, "আমার স্বর্গীয়া পত্নী

স্মৃতি, এই অঙ্গুরীয়—উহা আমার জীবন সদৃশ, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়াছিলাম, ভবদীয় কৃপায় ইহা পুনঃপ্রাপ্ত হইলে কৃতার্থ হইব। ইতি—

শ্রীঅন্নদাচরণ সরকার"।

সমস্ত সঙ্কল্পই বদলাইয়া ফেলিতে হইল এবং সেই সঙ্গে নূতন একটা সমস্যা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। আংটির প্রার্থী দুই জনের একজনও আংটির বর্ণনা পত্রে দেন নাই! অথচ বিজ্ঞাপনে এ কথা সুস্পষ্ট করিয়াই লেখা ছিল। এ আবেদন বিশ্বাসযোগ্য নয়। প্যাক করা কৌটা বাক্সে বন্ধ করিয়া দুইখানা পোষ্টকার্ড লিখিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া ডাকে পাঠাইতে দিলাম। কি রকম অঙ্গুরীয় খোয়া গিয়াছে, তাহা জানাইবার অনুরোধ করিলাম। সে হপ্তার বিজ্ঞাপনে প্রার্থীদের খোয়া যাওয়া আংটির সবিশেষ বিবরণসহ পত্র লিখিতে অনুরোধ করা হইল।

'চারু কর্ম্মকার' বা 'অন্নদা সরকারে'র পত্রোত্তর আসিল না, কিন্তু প্রতিদিনই আমার নিকটে দুইখানি চারিখানি করিয়া অঙ্গুরীয়ের জন্য আবেদন সহ নানা দেশ হইতে পত্র ও কার্ড আসিতে লাগিল। কোন কোন পত্রে আংটির একটু বর্ণনা দেওয়া থাকিত; কোন কোন পত্রে তাহাও থাকিত না। কিন্তু কোন বর্ণনার সহিত আমার বিজ্ঞাপন দেওয়া আংটির পূরা মিল হইত না। যদিও অধিকাংশ লোকে তাঁহাদের অঙ্গুলী-বিচ্যুত হীরকাঙ্গুরী যথাসাধ্য মূল্যবান্ বলিয়া বর্ণনা করিয়া লিখিতেন, তথাপি কিছু না কিছু গলদ থাকিয়াই যাইত। আর যাঁহারা লিখিতেন,—আমার আঙ্গুরীয়তে খুব বড় একখানা পোকরাজ দেওয়া আছে, কিংবা পান্না বা চুনির কোন উল্লেখ থাকিত, তাহাদের তো আর কথাই নাই, সেইখানেই চুকিয়া যাইত।

এমন করিয়া পাঁচমাস কাটিয়া গেল, ঝুড়ি করিয়া জমা করিলে প্রায় এক ঝুড়ি চিঠি এই হীরার আংটির দাবী করিতে আসিল। কিন্তু এমন একখানাও চিঠি পাইলাম না, যাহাতে আমার ঘাড়ের এই বোঝাটাকে সেইখানে নিক্ষেপ করিতে পারি। শুধু এই দেখিয়া অবাক্ হইলাম যে,বাঙ্গালা দেশের কত লোকই সমুদ্র ভ্রমণে গিয়া রত্নাকর গর্ভে রত্ন বিসর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন! বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম, প্যাক করা কৌটাটিকে যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিলাম। এ' কি এক গ্রহ জুটিল!

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমার ভৃত্য একখানা কার্ড আনিয়া দিল। তাহাতে একটি খৃষ্টানী নাম দেখিয়া সবিস্ময়ে নিজেই উঠিয়া গেলাম। বাহিরে একটি যুবক দাঁড়াইয়াছিলেন, ইনি আংটির প্রার্থী। ইনি গত বৎসর সমুদ্রতীরে একটি আংটি হারাইয়া আসিয়াছিলেন। সেই জন্য আমার বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া অবধি তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, হয় ত এটি তাঁহারই সেই অঙ্গুরীয়। কিন্তু ইহার কোন নিশ্চয়তা না থাকায় তিনি এপর্য্যন্ত দাবী করিতে সাহস করেন নাই আমার এই শেষ বিজ্ঞাপন—

"আংটির দাবী অনেকেই করিয়াছেন, কিন্তু তাহার একটিও বিশ্বাসযোগ্য না হওয়াতে কোন দাবী গ্রাহ্য করিতে পারি নাই। পরের জিনিষ যাঁহারা নিজের বলিয়া অনায়াসে হাতে পাতিতে পারেন তাঁহাদিগকে আর কি বলিব!"

এই বিজ্ঞাপন পড়িয়া তিনি আজ এখানে আসিয়াছেন, স্বচক্ষে দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, জিনিষটি তাঁহার কি না।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার আংটির সোণাটা কি রক ছিল,—বলুন দেখি?"

লোকটি আমার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, আমাকে আংটি দেখাইতে কুণ্ঠিত বুঝিয়া তাঁহার ঠোঁটের পাশে একটুখানি মৃদুহাসি প্রকাশ পাইল, তিনি কহিলেন, "গিনি সোনা, মশাই, আংটিটা সাহা-মুস্তফিদিগের ওখান থেকে গড়িয়েছিলুম কি না," তাই সোণাটা তাতে ভালই দেওয়া হয়েছিল।"

মনে একটু আশা হইল, তবু আর একটু পরীক্ষার দরকার। "আর হীরাখানা?" "কমল হীরে, চমৎকার হীরে, মশাই! ফাইন কাট্ হীরে! হীরেখানার আবার একটা ইতিহাস আছে, আমার মা একজন ইউরোপিয়ান্ লেডি ছিলেন, এ তাঁরই আংটির হীরে! মার স্মৃতিচিহ্ন! পুরাণ আংটিটে ভেঙে যাওয়াতে এই আংটিটে নতুন গড়িয়েছিলেন, তাইতেই তো, এই বিপত্তিটা ঘট্‌লো। আংটিটা একটু বড় হয়েছিল, হঠাৎ খুলে জলে পড়ে যায়।"

আমার আর দ্বিধা রহিল না; আংটিটা দেখিলে বোঝা যায় তাহা তেমন পুরাতন হয় নাই, নূতনই বটে। তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিয়া বাহির হইতে ভিতরে আংটি আনিতে গেলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আনা ঘটিল না। গৃহিণী বাক্স ও ট্রাঙ্কের চাবি আঁচলে বাঁধিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন, তিনি যে এক প্রহর রাত্রির পূর্ব্বে ফিরিয়া আসেন, এমন কোন সম্ভাবনা,—কোন দিনকার কোন নজিরের জোরে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। উত্ত্যক্ত চিত্তে ফিরিয়া আসিয়া ব্যাপার জানাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। উৎসুক যুবক মন-মরা ভাবে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইলেন, বলিয়া গেলেন, পরদিন আসিয়া আংটি লইয়া যাইবেন।

পরদিন প্রত্যুষেই লোক্যাল্ ডাকে একখানি পত্র পাইলাম। পত্রখানি এই।

"সবিনয় নিবেদন,

এই সপ্তাহের বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া মনে হইল, বিজ্ঞাপন-দাতা তাঁহার কুড়ান আংটির অনেকগুলি প্রার্থী লই নিতান্ত বিব্রত হইয়া উঠিয়াছেন, তাই অনিচ্ছার সহিত কর্ত্তব্যে এই পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম।

"কি রকম আপনার এ আংটি? ন সোনার এলবার্ট প্যাটার্ণের একটা হীরার আংটি হইবে কি? হীরাখানা এক রতির উপর ওজনে এবং তাহাকে ঘুরাইয়া দেখিলে যেন একটি ছোট গোলাপ ফুলের মত উহার ভিতর হইতে দেখায় কি? ভিতরের পিঠে ১০২৫ এই নম্বর লেখা আছে? যদি তাই হয়, তবে সে আংটিটা আমি যে অমূল্য রত্ন, রত্নাকর গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছি, ইহা তাঁহার অঙ্গুরী। শেষ পর্য্যন্ত তার অঙ্গুলিতে এমনই একটি আংটি ছিল, বেশ মনে আছে।

"আপনি দেখিতেছি ভদ্রলোক;—আপনার মত লোককে অনুরোধ করিতে কোন সঙ্কোচ নাই। যদি আংটিটী এইরূপই হয় তবে তাহা ৺'রামকৃষ্ণ মিশনে'র যে কোন সেবাশ্রমে পাঠাইয়া দিবেন আমার নিকট আর তাহা পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। কারণ উহা যাহার স্মৃতিচিহ্ন, সহস্র হীরকের চেয়েও তাহার স্মৃতি আমার এই চির অন্ধকার পরিপূর্ণ চিত্তকে আলোকিত করিয়া আছে। ঐ এক টুকরা ক্ষুদ্র হীরা সেখানে বেশী আর কি করিতে পারিবে?

আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন পরলোকে আবার তাহাকে দেখিতে পাই। জগতের মধ্যে ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।"

এ পত্রে স্বাক্ষর ছিল না, বা লেখকের কোন ঠিকানা দেওয়া ছিল না। বেশ মনে পড়িল, আংটিটির নম্বর ১০২৫ই বটে। বাড়ীর গৃহিণীকে সেদিন বেড়াইতে যাওয়ার জন্য অজস্র ধন্যবাদ দিলাম। কিছুক্ষণ পরে খৃষ্টান যুবকটী আসিয়া ম্লান মুখে ফিরিয়া গেল। শাসাইয়া গেল যে নালিশ করিয়া সে তাহার 'হকের ধন' লইবে।

শীল মোহর ভাঙ্গিতে হইল না, ঠিকানা কাটিতে হইল না, অতি সহজেই আমার ঘাড়ের সেই ক্ষুদ্রাকারের বৃহৎ বোঝাটি অতি সুচারুরূপেই নামিয়া গেল।

সে হপ্তার কাগজে বাহির হইল—

"আপনার আদেশ মত আংটি সেবাশ্রমে প্রেরিত হইল। ঈশ্বর আপনার মনস্কামনা পরিপূর্ণ করুন।"

ত্যাগের দিনে।

১

রুষ জাপান যুদ্ধের মহা যজ্ঞানল যখন এসিয়ার প্রান্তভাগে গগনস্পর্শী শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল আমি তখন জাপানে। সেই সময় আমি ও আমার কয়েকটী পরিচিত বন্ধু দেশলাই, সূচ, প্রভৃতি কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় বস্তুর প্রস্তুত প্রণালী শিখিতে জাপান গিয়াছিলাম।

আমাদের বোর্ডিংটী ঠিক সমুদ্রের উপরেই ছিল। বাড়ীটির তিনদিক্ বেশ খোলা, পিছন দিকে একটু বাগান ও তাহার পরেই সমুদ্রের বেলাভূমি। আমরা আমাদের কার্য্যাবসরে কোন সন্ধ্যায় বা কোন নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না রাত্রে বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে চাহিয়া দেখিতাম, অনন্ত নীলাম্বুরাশি শুভ্র ফেনপুঞ্জ পরিশোভিতাঙ্গে গর্জ্জন গানে নৈশাকাশ প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে বেলাভূমে আছড়াইয়া পড়িত।

বিদেশে আসিয়াছি। স্নেহময়ী জননীর স্নেহ অঙ্ক হইতে জননী ধরিত্রীর ধূলিময় কঠিন অঙ্গনে নামাইয়া দিলে, ক্ষুদ্র শিশু যেমন অনিচ্ছার ক্রন্দন কাঁদিতে থাকে, স্নেহচ্ছায়া সুশীতল গৃহ এবং আত্মীয় বন্ধু পরিত্যক্ত প্রবাসে থাকিয়া থাকিয়া প্রাণের ভিতরটাও যেন মধ্যে মধ্যে তেমনই করিয়া কাঁদিয়া উঠে।

সেদিন শীতের প্রভাত। তাজা যুদ্ধের সংবাদে ও উত্তপ্ত চায়ে আমাদের শীতল মস্তিষ্কও বেশ একটু গরম হইয়া উঠিয়াছিল।

শিরীষ নেপাল ও আমি এই তিন বন্ধুতে আমাদের চায়ের টেবিলটীকে তর্কের আসরে পরিণত করিয়া তুলিয়াছিলাম। এক এক লোকের চক্ষে জাপানের আগা হইতে গোড়া পর্য্যন্ত, এপাশ হইতে ওপাশ অবধি সমুদয়টাই ভাল ও অনুকরণীয়। আমার চোখে কিন্তু এটা একান্ত বিসদৃশ ঠেকিত। যার যেটা ভাল তার সেটাকে ভাল বলিব, কিন্তু তাই বলিয়াই যে তাহাকে একবারে মাথায় তুলিয়া নাচিতে হইবে, এমন কি কথা আছে?

এই লইয়া নেপালের সহিত আমার যখন তখন তর্ক হইত। আমি বলিতাম, "জাপান তোমার কে? জাপানের সহিত আমাদের চিরদিনের গুরু শিষ্য সম্বন্ধ ছিল। একদিন জাপান আমাদের কাছে যে ধার করিয়াছিল, আজ সেজন্য না হয় সে তাহার বদলে আমাদের তাহার অপূর্ব্ব স্বদেশপ্রেম শিক্ষা দিক্! অধ্যবসায়, স্বার্থত্যাগ, আত্মনির্ভরতা শিখাক্। তা' ছাড়া উহাদের কাছে আমরা আর কিছুই পাইব না, আর কিছু যেন দিয়াও বসি না, দিলে, আমাদের উপকার তো কিছুই নাই, বরং অপকারের ভয় কিছু কিছু আছে। এখানে অনেক জমা আছে, এখন আমাদের লইবার পালা,—দিবার আর কারুকে কিছুই দরকার নাই।" নেপাল সেদিন ভারি উত্তেজিত হইয়া বলিল, "সুধু দেশভক্তি! সুধু অধ্যবসায়! কি বলো? এদের কাছে আমাদের সবই শিখ্‌বার আছে। আচ্ছা জাপানী স্ত্রীলোকের মত স্ত্রীলোক আমাদের দেশে আছে?"

"কেন থাক্‌বে না? হাজার হাজার! রাখী বন্ধনের দিন দেখনি,—বঙ্গনারী তাদের স্বামীর সহধর্ম্মিণী, পিতার সুকন্যা, ভ্রাতার সহযোগিনী কি না? তোমরা যখন ম'রে আছ, তারাও তখন সহমৃতা।"

নেপাল এ কথায় চটিয়া উঠিয়া, মুখের নিকট হইতে চামচটা নামাইয়া সজোরে টেবিলের উপর মুষ্ট্যাঘাত করিয়া অধৈর্য্য ভাবে বলিয়া উঠিল, "আরে, রেখে দাও তোমার রাখী-বন্ধন! বড় তো একটা কাজ! আর তাতেও'বা ক'জনের উৎসাহ আছে শুনি! এমন ক'রে হাসিমুখে বাঙ্গালীর মেয়েরা স্বামী-পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে পারে? তা আর কখন পারতে হয় না। হরি হরি! ছেলে কলিকাতায় পড়তে গেলেই আমাদের মায়েরা পা মেলে কাঁদতে বসেন। কিছু তো আর আমার দেখা নেই!"

আমি হাসিয়া চা-পাত্র নিঃশেষ করিয়া বলিলাম, "ওইটুকুই তো তাঁদের মহত্ত্ব। দেশে যুদ্ধ নাই তা কোথায় কাকে পাঠাবেন? যখন দিন ভাল ছিল, তখন সংযুক্তা, যোধপুর মহিষী, ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈর অভাব ছিল না। তুমি যা-ই বল, আমি খুব বিশ্বাস করি যে আমাদের দেশের মেয়েরা এদের চেয়ে অনেক বড়। তেজস্বিতা জিনিসটা জাতির উন্নতির উপর মাত্র নির্ভর করে। কিন্তু নারীচিত্তের যে আদত সৌন্দর্য্য সেটুকু এঁদের ভাণ্ডারে ভারী কম, এতে আমাদের দেশের মেয়েদের কাছে আর কেউ দাঁড়াতে পারেন না। স্ত্রীলোককে এমন রক্ত-পিপাসিনী রাক্ষসীর বেশে সর্ব্বদা কি মানায়! তুমিই কেন বলো না? স্বদেশ-প্রেম জিনিসটা খুব বড়, আমিও তা স্বীকার করি। কিন্তু—কি চাও?" শেষের কথাটা যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা গেল সে একটী অল্প বয়সী জাপানী মেয়ে। ঘরের বাহির হইতে আগ্রহপূর্ণ নেত্রে সে আমাদের দিকে চাহিয়াছিল, যেন তাহার বিশেষ কিছু বলিবার আছে। আমার ভাঙ্গা ভাঙ্গা জাপানী ভাষা সে বুঝিতে পারিল, তখন সাহস করিয়া ঘরে ঢুকিয়া সে আমাদের সম্ভ্রমের সহিত

নমস্কার জানাইল এবং তারপর চোখ দুটি নীচু করিয়া, অশুদ্ধ ইংরাজীতে বলিল, "আজকের খবরের কাগজ পাই নাই। একখানা একবারের জন্য পাইতে পারি কি?"

মেয়েটির আগ্রহ দেখিয়া অগত্যাই অনিচ্ছার সহিত কাগজখানা মুড়িয়া তাহার হাতে দিলাম,—দিয়া কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি ইংরাজী বেশ বুঝতে পার?"

মেয়েটির পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া মনে হইয়াছিল, তাহার অবস্থা তেমন ভাল নয়। তাই এ প্রশ্নটা করিলাম। নহিলে এখানের বড় ঘরের মেয়েরা প্রায়ই ইংরাজী জানে। সে ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল, 'বুঝিতে পারে'।

শিরীষ বলিল, "আমরা এখনও সব পড়ি নাই, অনুগ্রহ ক'রে একটু শীঘ্র কাগজটা ফেরৎ দিবেন।"

এ কথা শুনিয়া জাপানী বালিকা একটু কুণ্ঠিত ভাবে কাগজখানি টেবিলের উপর রাখিতে গিয়া বলিল, "তবে না হয় আমিই একটু পরে আবার এসে নিয়ে যাবো।"

আমাদেরও সংবাদ সম্বন্ধে কৌতূহল ঘুচে নাই, তাই এ প্রস্তাবটা অপছন্দ হইল না, কিন্তু নেপালটা মাঝে হইতে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না, না তুমি নিয়ে যাও।" আমাদের উদ্দেশ করিয়া কহিল "ওদের দেশের যুদ্ধ সংবাদ ওদেরি আগে জানা উচিত, হয় তো কোন আপনার লোকের খবর জান্‌তে চায়।"

বালিকা কৃতজ্ঞ দৃষ্টির সহিত নম্র অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

২

বাস্তবিকই তাই। মিনামীর একমাত্র ভাইটি ভিন্ন এ সংসারে কেহ কোথাও আপনার বলিতে ছিল না। সেই সংসারের আশ্রয়, আজীবনের সঙ্গী, সুখে দুঃখের সমান অংশী, একমাত্র ভাইটি এখন একটি সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধে গিয়াছে। যাহার সহিত স্কুলের ঘণ্টা কয়টি ভিন্ন বিচ্ছেদ ছিল না, সেই ভায়ের সহিত আজ কতদিন হইল সে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে! আর তাহাদের মধ্যে এক খরতর শোণিতস্রোত-শালিনী ঘূর্ণাবর্ত্তময়ী মৃত্যু-নদীর ব্যবধান,—সেই বিচ্ছেদকে অধিকতর ভয়াবহ এবং দূরতর করিয়া রাখিয়াছিল। কে জানে সেই ভীষণ মরণ-নদীর কূল হইতে সে আবার ফিরিয়া তাহার এই স্নেহবন্ধনীড়ে আসিবে কি না! কিন্তু তাই বলিয়া প্রতীক্ষাকারিণীর নির্ভীকচিত্তে ভরসা ও উৎসাহের কিছু মাত্র অভাব লক্ষিত হইত না। সে প্রাণে মনে যেন তাহার প্রিয়তম ভাইএর বিজয়ী বীরমূর্ত্তি প্রত্যাবর্ত্তনশীল রূপে অঙ্কিত দেখিত। সে বলিত—কোটাকামাবংশীয় কেহ শত্রুহস্তে কখনও হত হয় নাই, শত্রুনাশই করিয়াছে।

মিনামী আজকাল আর আমাদের কাছে অপরিচিতা নয় আজকাল যুদ্ধ সংবাদটি সে সকলের আগে আগেই পড়িতে পায় কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সে কোন দিন বিচিত্র বর্ণের পুষ্পগুচ্ছের তোড় বাঁধিয়া আনিত, কোন দিন কিছু স্বহস্ত প্রস্তুত মিষ্টান্ন আনি এত বিনয়ের সহিত টেবিলের উপর রাখিয়া মুখের পানে চাহি যে হাজার বার লইব না স্থির করিয়াও, আমরা না লইয়া থাকি পারিতাম না। বলিতে কি, আজকাল এই বান্ধবহীন বিদে মিনামী যেন আমাদের একটি আকাঙ্ক্ষিতা বান্ধবী হইয়া উঠি

ছিল। আমাদের অবসর কাল তাহার মুখে তাহাদের দেশের নূতন, পুরাতন কীর্ত্তি কাহিনী শুনিতে শুনিতে কোন সময় শেষ হইয়া যাইত, বোঝাও যাইত না। বলিতে বলিতে বক্তার কণ্ঠ উৎসাহে উদ্দীপনায় কম্পিত হইত, আর তাহার দুইটি চক্ষু জ্বলিতে থাকিত। আমরা বিস্ময়ের সহিত তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতাম। আর বিস্মিত হইয়া ভাবিতাম, জাপানের প্রতি হৃদয়খানিই যেন স্বদেশ-প্রেম দিয়া গড়া! এখানে আজ কাল আর অন্য কোন কথা হয় না, আর কোন চিন্তাও বোধ হয় কাহার মনে উঠে না।

সে দিন বর্ষণক্লান্ত মেঘগুলা সারি সারি নীল আকাশের মহান্ পটখানাকে ঢাকিয়া বিস্তারিত পক্ষ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাখীর মত ঊর্দ্ধে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এক দিকে পর্ব্বতগুলি উচ্চ মস্তক আকাশে ঠেকাইয়া স্পর্দ্ধাভরে যেন মেঘমালাকে বিদ্রূপ করিতেছে। তা তাহারা করিতেও পারে! কেননা সেই ধূসর, ধূম্র ভীমকান্ত মেঘমূর্ত্তি হইলেও তাহারা অমন লঘুত্ব-গুণশালী নহে। বায়ু ছাড়িয়া ঝঞ্ঝাও তাহাদের এতটুকু চঞ্চল করিতে সমর্থ হয় না—অচল, অটল!

"ইণ্ডোজিন, আজিকার উৎসবে সকল জাতির পতাকা দেখ্‌লাম, কই তোমার জাতির তো দেখ্‌লাম না ?"

সহসা এই প্রশ্ন করিয়া মিনামী আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি অন্যমনস্ক ছিলাম বলিয়া সে কখন আসিয়াছে, জানিতে পারি নাই। মুহূর্ত্তমধ্যে প্রকৃতির সমুদয় সৌন্দর্য্য আমার চক্ষে যেন কালি-মাখা লজ্জার ভারে অনন্ত বিস্মৃতি সাগরে ডুবিয়া যাইতে চাহিল। ভাবিলাম, "তোমারই গৌরবে পূর্ণ এ বিশ্ব, আমরা দুঃখী আমরা নিঃস্ব।" কিন্তু মুখে কিছুই ফুটাইতে পারিল'ম না। কি বলিব ?"

৩

আমি যেদিন জাপান ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিলাম, তাহার পূর্ব্ব-দিন সমুদয় বিশ্ববাসীকে সচকিত করিয়া ভয়-সন্ত্রস্ত জাপানকে বিস্ময়ে আনন্দে চমকিত করিয়া এক আশ্চর্য্য সংবাদ প্রচারিত হইল। সুসেমার ভীষণ যুদ্ধে বাল্টিক ফ্লিট্ জাপানীয়ের হস্তে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে! এ পৃথিবীর বক্ষে তাহার আর চিহ্নও নাই! এ অবিশ্বাস্য সংবাদ প্রথমে আমরা যেন বিশ্বাসই করিতে পারি নাই। তারপর সে দেশব্যাপী যে বিজয়োল্লাস, সে যে উৎসব সমারোহ, সে সব আর বর্ণনা করিবার নয়! সে আনন্দে সমস্ত জাপান যেন মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল। বাদ্যে সঙ্গীতে ধ্বজ পতাকায়, বিশেষতঃ ফুলে ফুলে যেন সে দিন চারিদিক্ হইতে আমাদের সেকালের গৌরব যুগে ক্ষত্র-উৎসবে বসন্তোৎসব স্মরণ করাইয়া দিতেছিল।

সে আনন্দের তরঙ্গ আমাদের নির্জ্জন সমুদ্রকূলকেও পরিপ্লুত করিতে ছাড়ে নাই! আমরা এখানের অতিথি, আমরাও জাপানের গৌরবে আনন্দ প্রকাশ করিলাম।

সে দিন বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। পথে একদল মঙ্গল সঙ্গীতকারী সর্ব্বাঙ্গে পুষ্পভূষিত, জাতীয় পতাকাধারী, উৎসবমত্ত নরনারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাদের মধ্যে সুকণ্ঠী মিনামীই সর্ব্বাগ্রগামিনী। আমি সহসা চমকিয়া উঠিলাম! শুনিয়াছিলাম, এই যুদ্ধে মিনামীর একমাত্র ভ্রাতা কাপ্তেন কোটাকামা নিহত হইয়াছেন। কেমন করিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিব, তাহা সমস্ত দিন ভাবিয়াও আমি যেন স্থির করিতে পারি নাই।

জগতের একমাত্র অবলম্বন, বিশেষতঃ সে অবলম্বন আবার এব

মাতৃগর্ভস্থ সহোদর! মিনামী কি এ আঘাতে এতক্ষণ বাঁচিয়াই আছে? এমনই একটা সংশয়ও আমার মনে উঠিয়াছিল। ধন্য তুমি রমণী! স্বদেশ-প্রেম কি মনের সমুদায় সুকোমল বৃত্তিগুলিকে শুদ্ধ নিঃশেষে মুছিয়া দেয়? মহান্ পারাবারের প্লাবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খাল বিল জলপূর্ণ না হইয়া জলহীনা মরুভূমি হইয়া দাঁড়াইল বিধাতার এ কোন্ বিধানে? যাহোক্ ঈশ্বর আমাদের যে একটা বড় সৌভাগ্য হইতে সকলের চেয়ে সৌভাগ্যবান্ করিয়াছেন, এইজন্য মনে মনে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। হা, পাষাণী মিনানি! ভারতবর্ষে কখনও এ দৃশ্য দেখা যাইত না। সেখানে মানুষ আর যা-ই হোক্, স্নেহ, প্রেম, দয়ামায়া বিবর্জ্জিত পাষণ্ড নয়।

সে রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। কয় বৎসর পরে দেশে ফিরিব, সেখানকার প্রত্যেক ছোট বড় দৃশ্যগুলি প্রত্যেক উপেক্ষিত অনুপেক্ষিত মানুষগুলিকে হৃদয়ের মধ্যে যেন নিতান্ত আপনার বলিয়া বারবার করিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম। গভীররাত্রে বিনিদ্র শয্যা ত্যাগ করিয়া সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে লাগিলাম। প্রবাসের সঙ্গী ঐ শুভ্র তরঙ্গমালা, এই তীর তরুশ্রেণী একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম! মাথার উপর ঈষৎ কুয়াসাচ্ছন্ন আকাশে ছোট বড় অসংখ্য নক্ষত্র জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল। শুভ্র শুভ্র চলন্ত মেঘ ক্ষণে ক্ষণে চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিতেছিল। বেড়াইতে বেড়াইতে বাসার সম্মুখ ছাড়িয়া একটু দূরে চলিয়া গিয়াছিলাম। একপাশে পাথরের স্তূপ ঢাকিয়া বন্য লতাগুল্ম জন্মিয়াছিল, বেড়াইতে আসিয়া আমরা বহুদিন তাহার মধ্যস্থ একখানা পরিষ্কার পাথরকে বসিবার বেঞ্চ করিয়া লইতাম, আজও শেষবারের জন্য সেইখানে বসিতে গেলাম। একি! এত-

রাত্রে এই নির্জ্জন সমুদ্রতীরে, এই জনহীন বেলাভূমে ও, কে? মানুষ না কোন হিংস্র জন্তু! একটা হৃদয়ভেদী দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের শব্দে আমার দ্বিতীয় সন্দেহ ঘুচিয়া গেল, এ শব্দ মানুষের দ্বারা কৃত, তাহাতে সংশয় নাই। সন্দিগ্ধ-চিত্তে একটুখানি অগ্রসর হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কে?" উত্তর পাইলাম না! কিন্তু আমার অনতিদূরেই আবার একটু চাপা নিঃশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। তখন একখানা পাতলা মেঘ চাঁদের মুখখানাকে নববধূর সূক্ষ্ম ঘোমটার মত ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। তথাপি সেই তরল মেঘাবরণের মধ্য হইতে যে ক্ষীণ জ্যোৎস্নাটুকু প্রভাহীনভাবে বেলাভূমে বিকীর্ণ হইতেছিল, তাহারই সাহায্যে দেখিতে পাইলাম, সম্মুখের বড় পাথরখানার উপর এক মনুষ্যমূর্ত্তি। নিকটে গিয়া দাঁড়াইতেই বেশ বুঝিতে পারিলাম, যে ব্যক্তি এতক্ষণ আর্ত্তভাবে এখানে লুটাইয়া লুটাইয়া মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতেছিল। মনুষ্যসমাগমে এখন ক্রন্দন বিরত হইতে চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কোনমতেই সেই ব্যক্ত ক্রন্দনের অদম্য উচ্ছ্বাসকে প্রতিরোধ করিতে পারিতেছে না। সান্ত্বনাপূর্ণ কোমলস্বরে কহিলাম, "কে তুমি? এত রাত্রে কেনই বা এখানে বসিয়া আছ? আমি একজন বিদেশী। বল, আমি কি তোমার কিছুই উপকার করিতে পারি না?"

আমার কথা শুনিয়া কেন জানি না, জিজ্ঞাসিত প্রথমে যে একটু চমকাইয়া উঠিল, তারপর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকি অস্ফুট ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল,—"আপনি এসেছেন?" অতিম বিস্ময়ের সহিত আমি কলের মত বলিয়া উঠিলাম, "মিনামি!"

অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তি একটু নড়িয়া উঠিল, আবার একটা বেদনার

চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সে তেমনই ভাঙ্গা গলায় কহিল, "হাঁ, আপনি এত রাত্রে এখানে কেন?"

আমি বলিলাম, "আমি সমুদ্রের ধারে শেষবারের জন্য বেড়াতে এসেছিলাম। কিন্তু তুমি এরাত্রে এখানে কি কর্‌ছো মিনামি?"

উত্তর পাইলাম না। কিন্তু বুঝিতে পারিলাম সে কাঁদিতেছে। তখন সব মনে পড়িয়া গেল। ভুলিবার কথা নয়,—তথাপি মিনামীরই সন্ধ্যার ব্যবহারে যেন কি রকম গোলমাল করিয়া ভুলাইয়া দিয়াছিল। আর কিছু বলিতে পারিলাম না, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। বহুক্ষণ পরে অকস্মাৎ ভগ্নস্বরে সে প্রশ্ন করিল, "কেমন, ক্ষুদ্র জাপানের কীর্ত্তি দেখ্‌লেন?"

"ওঃ সে কথা আর বল্‌তে! দেশে যাচ্চি, মনে হচ্চে, যেন ভক্তির তীর্থ হ'তে—" মিনামী ঈষৎ চঞ্চল হইয়া বলিয়া উঠিল, "দেশে যাচ্চেন, কবে? এরই মধ্যে চল্‌লেন?"

তাহার কণ্ঠস্বরে একটা আগ্রহ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, তাহার করুণ স্বরটুকু আমার হৃদয়ের পর্দ্দায় গিয়া আঘাত করিল। একটু যেন অপ্রতিভভাবে কহিলাম, "হাঁ মিনামি! আমি কালই যাচ্চি। এই গৌরবের দিনে তুমি কাঁদ্‌ছো কেন মিনামি? তোমাদের মত দেশের মেয়েদের এমন দুর্ব্বলের মত কান্না তো মানায় না।"

গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া জাপানী বালিকা কিছুক্ষণ নীরব রহিল, তারপর অসম্বরণীয় হৃদয়াবেগে আকুল উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "আমায় আজ রাত্রের মত একটুখানি অবসর দিন, নহিলে সে কি মনে কর্‌বে? এখনও স্বর্গের দেবতারা জাগ্রৎ আছেন, কিন্তু দেখুন পৃথিবীতে এই আমরা দুজন ভিন্ন বোধ করি আর কেউ কোথাও

জেগে নাই! এ অবসরটুকু তাই শুধু আমার প্রাণাধিক ভাইয়ের স্মৃতির জন্য! পৃথিবীর লোক জাগ্‌লেই আবার আমার স্বদেশ, আমার পৃথিবীর স্বর্গ, আমার ভাইয়ের চেয়েও প্রিয়তর স্বদেশের মঙ্গল-উৎসবে যোগ দিতে হবে। কিন্তু এটুকু অবসর না পেলে বুক আমার যে ফেটে যাচ্চে। আমার আর সময় কোথা?"

মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, "মিনামি, তোমায় আমি ভুল বুঝেছিলাম, ভেবেছিলাম, রক্তপিপাসু প্রতিহিংসা ব্যতীত, তোমাদের মনের আর কোন কোমল বৃত্তিই বাঁচিয়া নাই! তা' নয়, রমণী সর্ব্বত্রই রমণী। স্নেহে, প্রেমে, ত্যাগে সকলদেশেই নারী-প্রকৃতি এক। কেবল বাড়ার ভাগ তোমরা কর্ত্তব্যের প্রতিমূর্ত্তি! ত্যাগের জীবন্ত ছবি!

পরদিন প্রাতে ষ্টেশনের পথে একদল উৎসবমত্ত নরনারীর মধ্যে, সুবেশা মিনামীকে মঙ্গল সঙ্গীতকারীদের সম্মুখভাগেই দেখিলাম। তাহার মুখ দেখিয়া সন্দেহ হইল, কাল রাত্রের ঘটনা সত্য কি স্বপ্ন!

কিন্তু শুধু কি সে-ই একা? আজ সমগ্র জাপানের সমস্ত উৎসবমত্তা রমণীই তো মিনামী।

ধূমকেতু

লোকে বলিত, তারিণীদত্ত টাকার আণ্ডিল বাঁধিয়াছে; আবা তাহারাই বলিত যে, সে টাকা লইয়া নাকি 'যখ' দিবে। টাকা আণ্ডিল তারিণী যে বাঁধিয়া না ছিল, এমন নয়, কিন্তু 'যখ' দিবা ইচ্ছাটা এখনও তাহার মনে জাগে নাই ;—কখনও যে, জাগিবে এমন কোন চিহ্নও পাওয়া যায় না। তাহার কারণ 'যখ' দিলে, টাকা মাটি মধ্যে পুঁতিতে হয় বলিয়াই শোনা গিয়াছে, অথচ সেই বীজভূত টাক হইতে বৃক্ষাঙ্কুরও নাকি নির্গত হয় না। এদিকে আবার তাহার স্ব ফলোৎপাদিকা শক্তি তখন বিফলা হইয়া যায়—অর্থাৎ সুদ বন্ধ হ টাকা বাড়ে না।

যে সকল হিন্দুস্থানী বড় লোকের ছেলেরা নাচের মজলিসে বসিয়া, মুজরাওয়ালীর নূপুর-নিক্কণের মূল্য-স্বরূপ মদিরারঞ্জিত খোস মেজাজে তাহাকে ত্রিশূন্যের যে কোন সংখ্যা রজতমুদ্রা ফরমায়েস করেন এবং সেই সুষুপ্তিমগ্ন অর্দ্ধরাত্রে সেই ফরমাজি পুরস্কার সেই মুহূর্তে সংগৃহীত হয়, তখন তারিণীদত্তর লোহার সিন্দুকই তাহা সরবরাহ করে। ে টাকার কি দিব্যতেজ! তাহা রাবণের নিক্ষিপ্ত শৈলরাজ শক্তির ন্যা সদ্যঃসংহারী মহাস্ত্র! বাবুর আদেশ,—সেই ক্ষণেই যেরূপে হয়, ঈপ্সি অর্থ চাহি।—উত্তমর্ণ বলেন, একশতের সুদ একশত আট না দিে এমন সময় টাকা বাহির করিবে কে? বিশেষ মা-লক্ষ্মীকে কি রাে ঘুমন্ত-বিদায় করিতে আছে? বাবুর হৃদয়-বন্যায় তখন জোয়ারের বে

বহিতেছে, সে কোন্ বাধার নিষেধে শান্ত হইবে? কাজেই একটা খত লিখিয়া চারি সহস্র মুদ্রার [illegible] সহস্রে, তিনশত কুড়ি টাকা সুদ-স্বীকার ও সেই ক্ষণে সেলামী-[illegible] দশ টাকা বাদ দিয়া, তিন সহস্র ছয়শত নগদ মুদ্রা গ্রহণ [illegible]। বলা বাহুল্য, ইহার মধ্যে আবার তিনশত পঞ্চাশ, কর্ম্মচারীর ঘরে উঠিত; বাবু পাইতেন, তিন হাজার দুইশত; বাকি পঞ্চাশ কি হইত, তাহার খবর ঠিক মিলে না। কিন্তু তিন বৎসরের সুদ ও তস্য, তস্য, তস্য সুদে এই সূচিকালাঙ্গলের ফলারূপে একটা জমিদারী-খণ্ডের ভূমি আকর্ষণ করিয়া উঠিতে বাধিত না। তারপর সেটা উচ্চডাকে শত্রুপক্ষকে বেচিয়া তারিণী দত্তের লৌহসিন্দুক ভরিয়া উঠিত এবং শোণিতাস্বাদ প্রাপ্ত বাঘ যেমন শোণিতের গন্ধে মাতিয়া উঠে, তেমনই করিয়া সে-ও সুযোগান্তরের প্রতীক্ষা করিতে থাকিত। আর সুযোগ—? দেশে কুলাঙ্গারের কিছু অভাব ঘটিতেছে, বলিতে পারেন?

এমনই চিরদিন চলিতেছে। ওদিকে যখন কর্ম্মকাজ ছিল, অন্যদিক দিয়া টাকাকড়ি গৃহজাত হইতেছিল; তা, দেবতা ব্রাহ্মণের কৃপায় সে উপার্জ্জনও বড় কম ছিল না। তখন টাকার নেশাটাও বুঝি কিছু কমই ছিল। কিন্তু যখন ষষ্ঠী ঠাকুরাণীর অপ্রত্যাশিত কৃপা, কৃতান্ত-দেবতার অনুচর অনু[illegible]বর্গ দ্বারা খণ্ডিত হইতে লাগিল, একে একে উমেশ, করুণা ও নীলমণি তিন পুত্র ও হেমন্ত—রাজবালা নামে দুই কন্যা, কেহ মা-শীতলার হস্তে শীতল হইল, কেহ ওলাদেবী বা প্লেগাধিষ্ঠাত্রীর কৃপা-ঈক্ষণের ফলে সংসার হইতে অপসৃত হইল, তখন হইতেই তারিণীদত্তের সমুদয় স্নেহপ্রীতির সঞ্চার, তাহার অকৃতজ্ঞ সন্তানসন্ততির উপর হইতে

অপসৃত হইয়া, কৃতজ্ঞ অর্থরাশির উপরেই [illegible] হইয়াছিল। ছেলে-মেয়েগুলা যেন এক সঙ্গে সড় করিয়া [illegible] করিবার জন্তই এই কাজটা করিয়াছে, এইরূপ একটা তীব্র [illegible] তিনি তাহাদের ’পরে অনুভব করিয়া, যেন সেই বিদ্রোহিদলের জন্ত শোকপরিহার মানসেই বিপুল উত্তমে টাকার সুদ চড়াইয়া অর্থবৃদ্ধির দিকে একান্ত মনোযোগ দান করিলেন। বাহিরের লোকে দেখিয়া শুনিয়া বলিল,—“বুড়র ভীমরতি ধরিয়াছে, এইবার ও মরিবে।” কিন্তু কিছুদিন পরে যখন তাহার মরিবার কোন উদ্যোগ-আয়োজন দেখা গেল না, তখন সকলে বিস্ময়ে মুখ তাকাতাকি করিয়া অবাক্ হইল। কেহ কহিল, “এ রকম হ’য়ে থাকে—বলে, ‘অল্প শোকে কাতর—আর বিস্তর শোকে পাথর।’ দেখ্‌ছ না এর সেই রকম হয়েছে।”

তা যাই হোক্, তারিণী কোন দিকের কোন কথায় কর্ণপাত করিল না, সে সমান উৎসাহে টাকা ধার, জমীদারী বন্ধক ও ডিক্রিজারি প্রভৃতি বড় বড় কার্য্য-স্রোতে নিজেকে নিমগ্ন রাখিয়া, মৃত্যুরূপী হলাহলের সুতীব্র বিষজ্বালা মৃত্যুঞ্জয়ের মত জিতিয়া লইল। প্রকাণ্ড বাড়ীটা খাঁ খাঁ করিয়া প্রাণের মধ্যে একটা নিদারুণ হতাশার আগুনে-ঝড় বহাইতে থাকে, ঘরের রুদ্ধ দুয়ারগুলায় ধুলা পুরু হইয়া পড়ে, ধূলিম্লান গৃহসজ্জাগুলা শোকদীর্ণ বক্ষে তাহার মুখের দিকে তাকায়, আর সে সিন্দুক খুলিয়া টাকা গুণিতে থাকে—ঝন্ ঝন্ ঝনাৎ। কি মিঠা বুলি! করুণার পুত্রটিও বুঝি, অমন মধুর সুরে কথা কহিত না! কন্যা হেমন্তর হাসিটুকুর বীণাঝঙ্কারী তান মধ্যে মধ্যে কাণের পর্দ্দায় এখনও আঘাত করে বটে কিন্তু সেই অপসৃত সুরের ধ্যানের চেয়ে, যাহা নিজের কাছে আছে তাহারই চিন্তা শ্রেয়ঃ নহে কি?

দুই পুত্রবধূও এ[illegible] পর একটি একে একে বিদায় লইল; রাজবালার স্বামী [illegible]জাকে দাহ করিয়া আসিয়াই তাহার পরিত্যক্ত রোগে আ[illegible]য়া, ব্রণজর্জ্জরিত শরীরের জ্বালায় ছট্ ফট্ করিয়া, সকলের সহযাত্রী হইলেন। ছোটবধূর খোকাখুকী দুটির একটিও রহিল না; গৃহিণী অসহ্য শোকের বজ্রানলে ঝলসিত হইয়া দুটি বৎসর জন্মান্তরের পাপ খণ্ডন করিলেন; তারপর এক গ্রীষ্মঅপরাহ্নে সমস্ত রোগশোকের জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া শান্ত চিত্তে কর্ম্মানুরূপ লোকে গমন করিয়া জুড়াইলেন। সেই প্রকাণ্ড পুরী মধ্যে অতগুলি মানুষের ভিতর জীবিত রহিল—তারিণী দত্ত এবং রাজবালার কন্যা সুহাসিনী। নীলমণির স্ত্রীও বাঁচিয়াছিল,—কিন্তু পাছে এবাড়ীর বাতাসে কন্যাটির নরজন্ম অতি শীঘ্র সমাপ্ত হইয়া যায়, সেই ভয়ে নীলমণির শ্বশুর, কন্যাকে তাহার শ্বশুরগৃহে পাঠাইলেন না। লোকে বলিল—"আরে এমন আহাম্মকের কাজও করে, বুড়র সেবা করুক গিয়ে, বিষয়ের ভাগ পাবে।" পিতা উত্তর দিলেন,—"বিষয়ের ভাগে আর কাজ নাই; যে ঘরে বিয়ে দিয়াছিলাম, মেয়েটা এখন বেঁচে থাক্‌লেই বাঁচি।"

তারিণীর ইহাতে কোন দুঃখ ছিল না। প্রথম যখন উমেশ মরিয়াছিল, তখন একবার সে স্ত্রীকে বলে,—"গিন্নি আর দেখ্‌চ কি, চলো দুজনে গঙ্গা উলিগে যাই।" কিন্তু এখন! এখন আর সেদিন নাই! যে হতভাগ্য অল্পজীবী সন্তানগুলা তাঁহাকে ফাঁকি দিতে গিয়া নিজের ফাঁকে পড়িল, তাহাদের কাহারও প্রতি তাঁহার আর স্নেহলেশ ছিল না তা ছাড়া বুঝি বরাবর একটু কমই ছিল। যাহাকে ভালবাসি তাহাকেই লইয়া থাকিতে পাই, সেও কিছু অল্প সুখ নহে। যখ

দেখা গেল, পোষ্য কমায় টাকাটা [illegible] বাড়িয়াই চলিয়াছে, তখন যাহারা আছে, তাহাদের প্রতিও [illegible]চের দিকে মন পড়িয়া গেল। বধূর বাপ পাঠাইল না—একটা [illegible] বেশ ভালই ছুতাটি মিলিয়া গিয়াছে। এখন কেবল নিজে—আর সুহাসিনী,—তা হউক খুব বেশী খরচ হইবে না।

সুহাসিনী মেয়েটি বড় শান্ত। শৈশবে শোকের ঝড় খাইয়া ভূলুণ্ঠিতা লতাটির মত মাটির পরেই সে বাড়িয়াছে, তাই সময় মত ফুল ধরে, ফলও হয় কিন্তু সবই যেন চুপিচাপি, ধীরে ধীরে। সে বড় হইতেছে, কৈশোর পার হইবার সময়ও আসিল, কিন্তু নিজে সে এ বসন্তাগমের কোন খবরই পাইল না। কারণ সে ত সহকারাশ্রয়ে মাথা খাড়া করিতে পায় নাই,—মাটির বুকে পড়িয়া কোন রকমে বাঁচিয়া আছে। কিন্তু সে সেই খবরে অজ্ঞ থাকিলে কি হইবে, পাড়ার পাঁচজনের কাছে সংবাদটা পৌঁছিয়াছিল। তাহারা মরুভূমির মধ্যে কোকিলের সাড়া পাইয়া দেখিতে আসিল; আসিয়া দেখিল, মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্রে ছিন্নলতা নববসন্তভূষণে খচিত হইয়া উঠিয়াছে।

তারিণীদত্ত এদিকে দিবা নিশ্চিন্ত মনে ৯৯কে একশতে পরিণত করিতেছিল। এমনি করিয়া মাসের পর মাসে শতের সংখ্যা সহস্রে উঠিয়া ক্রমে আবার সে সংখ্যাগুলাও চড়িয়া উঠিতেছিল। এমন সময় ঘটকঠাকুর অযাচিত হইয়া আসিয়া খবর দিলেন, "নাতিনী সুহাসিনীর জন্য ভাল বরপাত্র আসিয়াছে, তাহারা বেশী খাঁই করে না—মোটে আট হাজার টাকা সর্ব্ব রকমে পাইলেই হইল, কেননা ভবিষ্যতে সকলই তো মেয়ের হইবে! বর চারিটা পাশ করা।" শুনিয়াই তারিণীদত্তর চক্ষু কপালে উঠিল।—আট—হাজার টাকা?

আটখানা কোম্পানির [illegible] গাঁথিয়া রাখিলেও যে, বৎসর তাহারা দুইশত আশী টাকা [illegible]তে সক্ষম। একটা চাক্‌রে ছেলে! ঘটককে বলিলেন, [illegible] কি পাগল হয়েছ—অত টাকা কোথা পাইব! একটি গরীব-[illegible] দেখে বর খুঁজে দাও।”

সংসারে ফরমাইস দিলে সকল জিনিষই মিলে। চারিটা পাশ করা বড় লোকের সন্তান বঁরের পরিবর্ত্তে একটি দেড়খানি পাশ করা বিধবা-সন্তান গরীব-বর অল্প দিনের মধ্যেই লাল চেলি ও একগাছি গড়ে-মালা পরিয়া আসিয়া সুহাসিনীর সহিত সেই গাছা বদল করিয়া গেল।

মানুষে বেশী আশা করিতে গেলেই নিরাশ হয়; এ সংসারে পদে পদে আমরা ইহা দেখিয়া আসিতেছি। সুহাসিনীর বর অপ্রকাশচন্দ্র ও তাহার লোভাতুরা মাতা বিবাহের অতি অল্প পরেই নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। ঠাকুরদাদা বড় লোক ও নাতিনী তাহার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হইলে কি হয়, তাঁহার সিন্দুকের কড়ি গণ্ডির বাহির করা বড়ই কঠিন কাজ। অপ্রকাশের আশা ছিল, বিবাহের দ্বারা সে নিজের পড়াশুনার কিছু সুবিধা করিয়া লইতে পারিবে, কিন্তু ঠাকুরদাদা শুনিয়া থমকিয়া দুইচক্ষু কপালে উঠাইলেন। “পড়ার খরচ আমি দিব! তোমরা কি আমায় ক্রোড়পতি ঠাহর করেছ নাকি?”—লাজুক অভিমানী অপু আর কিছুই বলিতে পারিল না। ঘরে এমন স্বচ্ছলতা নাই, যাহাতে তাহাকে পড়িবার সুযোগ দেয়। সে শেষ-আশা-নাশে মর্ম্মাহত হইল।

তারিণীদত্ত দেখিলেন, নাতিনীর বিবাহ দিয়া তাঁহার এক কাল হইল। নাতজামাই আসিতে বলা হোক্, না হোক্ হামেসাই আসিয়া

উপস্থিত হইতেছে। আসিলে দুই তিন দিনের কমে যাইতেই চাহে না। মেয়েটাও আবার তেমনই—তাহাকে যদি বলা যায়, জামাই মানুষের সদাসর্ব্বদা আসা ভাল দেখায় না—তুই একটু বারণ করতে পারিস্ নে! তাহাতে তাহার দুই চোখ অমনি জলে ভরিয়া উঠে। নির্লজ্জতার দিনকাল পড়িয়াছে—তা সেই বা করিবে কি!

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে অপ্রকাশ স্থির করিল, বিদ্যালাভের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া সে চাকরী করিবে ও সুহাসিনীকে ঘরে আনিবে। অনেক কষ্টে একটি কুড়িটাকা মাহিনার চাকরী যোগাড় করিয়া সুহাসিনীর নিকট গেল।

সেদিন বর্ষার মেঘ ডম্বরু বাজিয়া উঠিয়াছে। নবীন নীরদজালে চারিদিক্ সমাচ্ছন্ন; সুহাসিনী কাপড় তুলিয়া দ্রুতপদে ছাদ হইতে ফিরিতেছিল, এমন সময় সহসা সে কাহার আদরপূর্ণ ভুজপাশে বন্দী হইল।

"এসেছ!"—সে একটু মধুর হাসি হাসিল। ওই ভাষাটুকু দিয়া যতখানি প্রকাশ করিতে পারিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা আর বেশী প্রকাশ চেষ্টা মানুষের দ্বারা হয় না। ইহারি মধ্যে অনেকদিক হইতে অনেক অর্থ নিহিত আছে। অর্থাৎ তোমার আসিবার কথা ছিল,—এসেছ! আমি তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম,—এসেছ! মেঘ দেখিয়া, হয় ত আসিবে না বলিয়া মনে বড় সংশয় জাগিতেছিল—এসেছ!

অপু তাহাকে কাছে টানিয়া কহিল,—"না এসে কি থাক্‌তে পারি সুহাস! ঠাকুরদাদা পছন্দ করেন না, তবু কেবল কেবলই আসি।"

"ও কথা ছেড়ে দাও, ঠাকুরদাদার ও একটা বাতিক। কি

কর্‌বে, আমার যেমন [illegible] মা-বাবারা থাক্‌লে কি এমন হতো!" —সে গভীর নিঃশ্বাস [illegible] করিল।

অপ্রকাশ তা[illegible]ত দেখিয়া, তাড়াতাড়ি আর নিকটে টানিয়া লইয়া, আদর করিয়া কহিল—"তার জন্য কি হয়েচে—তুমি তো আমায় ভালবাস হাসি, আমার সেই ঢের!" যথার্থই সুহাসিনী তাহাকে ইহার মধ্যেই প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসে। এত অল্পদিনে হিন্দু-ঘরের বালিকা, বোধ হয়, ভাল করিয়া স্বামী চিনিতেও পারে না, কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে সে পত্নীপদের সকল অংশই গ্রহণ করিয়াছিল। কারণ, জগতে আসিয়া সে এই প্রথমবার যথার্থ যত্ন ভালবাসা লাভ করিয়াছে। এই কৃতজ্ঞতায় তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু যেন তাহাকে এক মুহূর্ত্তে সকল দিনের সকল অসম্পূর্ণতার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া নবজীবন দান করিয়াছিল। ধনী-গৃহের চির অনাদৃতা আজ দরিদ্র জীবনের অমূল্য প্রেম-সাম্রাজ্য-প্রান্তে রাজেন্দ্রাণীর মহিমা লাভ করিয়াছে।

স্বামীর স্নেহপূর্ণ বাক্যে সে প্রীতি-ভরা সজল নেত্র দুইটি তাহার সাগ্রহ নেত্রে স্থাপন করিয়া, একটুখানি সুখের হাসি হাসিল। যেন বলিল—"তোমায় ভাল না বাসিয়া কি লইয়া থাকিব? তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব!"

২

ঠাকুরদাদা বড় বিপন্ন। পাঁচ দিন ছয় দিন ধরিয়া, অবিশ্রান্তই ধারাপাত চলিতেছে—বে-মেরামত পুরাণো বাড়ীর ছাদগুলা সেই মুষল প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া হু হু শব্দে অশ্রুবর্ষণ আরম্ভ করিয়াছিল।

আলকাতরা ও বালি, সে দীর্ণবিদীর্ণ অঙ্গ[illegible] জোড়া লাগাইতে অক্ষম হইয়া, অশ্রুজলে ধৌত কজ্জলরাগের শ্যাম গৃহভিত্তি প্লাবিত করিতেছিল। ইহার উপর আবার নাতজামাইএর ব্যবহারে তিনি আতঙ্কে অস্থির হইয়া আছেন;—সেটা সেই যে ধূমকেতু মাথায় লইয়া বাড়ী আসিল, সেই অবধি বৃষ্টিও যাইতে চাহে না, সেও যাইতে চাহে না। ঘরে জামাই আসিলেই খরচ;—নিত্য চারি পয়সার মাছ এবং দু পয়সার তরকারি হইলেই সংসার চলিয়া যায়; ঘরে লাউ, কুমড়া, শাক-সব্জি থাকিলে সে পয়সা দুটাও বেশীর ভাগই বাঁচে। আজকাল দুবেলায় ছয় পয়সার মাছ, চার পয়সার জলখাবার লাগিতেছে! এ বাড়ীতে ইদানীং পানের খরচটা ছিলই না; তেমনই কি ইনি পানের একেবারে যম! দু পয়সার পান, দু পয়সার মসলা নিত্য চাই, তবু সর্ব্বানন্দ-বেটার মন উঠে না। পুরাণ চাকর বলিয়া অনেক সহা যায় তাই;—বেটা বলে কি না—'দাদা-বাবুরা থাক্‌লে, দিদিমণি থাক্‌লে, অমন জামাই—কত আদর কর্‌তো—এ'কি জামাই এর মত কিছু হচ্চে!'—এততেও হয় না! আর কি করিতে হইবে? কোলে লইয়া নাচিতে হইবে নাকি?

যেদিন বৃষ্টি একটু ধরিল, খাওয়া-দাওয়ার পর চাকরদের লইয়া তারিণী-বাবু আলকাতরা-বালির দাগরাজীতে ছাদগুলা ভরাইয়া ফেলিলেন। বড় বড় বিচিত্র ডোরায় ছাদ চিত্রিত হইয়া গেলে, তদুপরি খড়পালা, কাষ্ঠখণ্ড চাপাইয়া, নীচে নামিতেই দেখিলেন—বারান্দায় নাত-জামাই পান চিবাইতে চিবাইতে পাইচারি করিতেছে। দেখিয়াই তাঁহার পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল,—মনে মনে বলিলেন—"গোরু মরিয়া মানুষ হয় বটে, জাবরকাটা অভ্যাসটি এ জন্মেও গেল না! সাধে

বলে—'স্বভাব যায় না [illegible]" প্রকাশ্যে বলিলেন—"কিহে অপু, আজই তো তা হ'লে [illegible]—কেমন, না ?'

অপ্রকাশ একটু [illegible] অপ্রতিভ হইল, সে পা দিয়া মাটি খুঁটিতে খুঁটিতে মৃদু মৃদু উত্তর [illegible]—"আজ ? না—আজ তো যাচ্ছিনে, মনে কর্‌চি কাল কিম্বা,—" তারিণীচরণ ঘোর অসহিষ্ণু ভাবে বাধা দান করিয়া বলিলেন, "ওহে না না, ছেলেমানুষ তোমরা বোঝ না, আজ বৃষ্টি থেমেচে—কিম্বায় আর কাজ নেই! আজই এসো গিয়ে—চাই কি আবার রাত থেকে নাম্‌তে পারে। আবার আজ শনিবার—, নামে তো আবার সেই সাতদিন। সাত, সাতদিন কি আবার শ্বশুরবাড়ী ব'সে থাক্‌তে পার্‌বে? ও দেরি আর করা ঠিক হবে না।"

অপ্রকাশ কহিল—"আচ্ছা আজই যাবো; মা বলেছিলেন—ওকেও এবার আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে,—তা হ'লে ওকেও আজ আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন্ না।"

তারিণী প্রমাদ গণিলেন। মেয়েটাই ঘর-সংসারটা মাথায় করিয়া রাখিয়াছে, সে গেলে চাকর বেটারা কি কিছু কোথাও আর রাখিবে? তা ছাড়া মেয়ে পাঠানয় কিছু খরচও তো আছে। তা[illegible]তে আবার এইবার দ্বিরাগমন! ভাল কথা মনে পড়িয়াছে;—[illegible] করিয়া কহিয়া উঠিলেন—"এই দেখ—যোড়া বছর যাই পড়্‌লো, অমনি তোমার মায়ের বউ নিয়ে যাবার চাড় হলো; কি ক'রে পাঠাই! তা ছাড়া বাপু, এখন পোড়ো ছেলে, পড়া-শোনা করগে—বউ তো আর কোথাও পালাবে না।"

অপ্রকাশ ভালমানুষ, ক্ষণিকের উত্তেজনা তাহার শান্ত হইয়া

আসিয়াছিল; সে একটু দুঃখের সহিত হাসিল। মনে মনে বলিল,—"বিশ্বাস কি! যে বাড়ী!" প্রকাশ্যে কিছুই বলিল না।

সেদিন সে যখন ট্রেণে চাপিয়া বসিল এবং ট্রেণখানা হু হু শব্দে তাহাকে সুহাসিনীর নিকট হইতে যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া, ক্রমেই অনেক দূরে সরাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল, তখন তাহার মনের ভিতরটাও যেন তেমনই দূর ব্যবধান হইয়া গিয়াছে বলিয়া সে অনুভব করিতেছিল। ঠাকুরদাদার গৃহে এ নিঃস্ব ভিখারী-বেশে আর না। যদি কখন মানুষ হয়, তবেই সে মনুষ্যত্বের দাবীতে স্ত্রীকে লইতে আসিবে। কিন্তু হায়, এসব গল্পেই শোভা পাইয়া থাকে! মানুষ এত সহজে এ গুমর করিতে পারে না। সহায়হীন কর্ম্মক্ষেত্র সম্মুখে পড়িয়া, সে কিসের জোরে এ পথ কাটাইবে? কালই যে, একটা দশ টাকার কেরাণীগিরির উমেদারীতে তাহাকে পথে বাহির হইতে হইবে। নানা বড়লোকের বাড়ী বিবাহ দিয়া দায়মুক্ত, চিরদিনই বা কে কাহাকে পুষিতে পারে!

কখন কে উঠিতেছে,—নামিয়া যাইতেছে,—আবার কতকগুলি নূতন লোকে মোটঘাট লইয়া সেই স্থান দখল করিয়া ফেলিতেছে, জানাও যায় নাই। হঠাৎ সে তাহার বাহুমূলে একটা স্পর্শ অনুভব করিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা সকৌতুক কণ্ঠ তাহার কাণের কাছে বাজিয়া উঠিল, "চিন্‌তে পারো?" অপ্রকাশ মুখ ফিরাইয়া দেখিল, বিবাহরাত্রে তাহার এক শ্যালক-সম্বন্ধীয় যুবক তাহাকে লইয়া অনেক রঙ্গরহস্য করিয়াছিল—সেই দেবনাথ!

দেবনাথ বড় সেয়ানা ছেলে, সে অতি শীঘ্রই অপ্রকাশের মনের ভাব বুঝিয়া কথাগুলি বাহির করিয়া লইল। সব শুনিয়া সে হাসিয়া বলিল—"এমন বোকারাম! ও বুড়র হাত থেকে কেমন ক'রে টাকা

বার ক'র্‌তে হয়, [illegible] দেখ্‌বে?”—অপ্রকাশের মন ভাল ছিল না, তথাপি এ [illegible] ফেলিল,—“পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিম দিকে উঠ্‌তে পারে—[illegible]

“যদি পারি?”

“অসম্ভব।”

“বাজি রাখ, যদি পারি?”

“আমার কি আছে?”

“আমার বোনের কেনা হ'য়ে থাক্‌বে তো?”

অপ্রকাশ হাসিল; মনে মনে বলিল—“এমনিতেই তো আছি।”

দেবনাথ বলিল—“একমাস চাকরী খুঁজো না—এর মধ্যে না পারি লিখে পাঠাব, তখন যা হয় ক'রো।”

৩

নাতি দেবনাথকে বুড়া দুদিনেই ভালবাসিয়া বসিল। এমন ভাল ছেলে তারিণী দত্ত তাহার জীবনে দেখিয়াছে বলিয়া মনে প[illegible]ড় না। পাচক মাছ তরকারি না বাড়াইলে, শুধু ভাত দিতে বাধ্য হইবে[illegible]য়, সে বলিল,—সে মাছ খায় না,—তরকারিও তেমন পছন্দ ক[illegible], কেবল লবণ-সংযুক্ত লেবু মাখিয়া ভাত খায়।—লেবুর গাছ তো বাড়ীতেই আছে। তা ভাতও বেশ ভদ্রলোকের মতই খাওয়া,—এই এতকটি হইলেই হয়! অম্বলের ব্যারাম—জল খাবার খাওয়া অভ্যাস নাই। পান, তামাক বা চুরোট সর্ব্ব প্রকার নেশা-বিবর্জ্জিত সদভ্যাস। এমন না হইলে ছেলে! —দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়! তারিণী দত্ত নাত-জামাইএর নিন্দা করিলেন। বলিলেন, “দেখেছ হে শালার আক্কেল! বলে পড়ার

খরচা দাও! আমি তার পড়ার খরচ ... ক'রে? আমায় কি কেউ রোজগার ক'রে এনে দিচ্চে? ... টাকা আছে তা খাচ্চি; ফুরিয়ে গেলে আমার হবে ... দেবু, ছেলেপিলে সব গেছে, এক রকমে কেটে যাচ্চে। ... যদি টাকাগুলো যেত, তাদের হাত ধ'রে পথে পথে বেড়াতে হতো ...? টাকার চে... কেউ নয়, তা যতই বল।" দেবু তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া গেল—"বটে তো—ওসব আজকালকার এক ফ্যাসান উঠেচে। টাকা কি অমনি খোলামকুচি, যে, 'দাও' বল্লেই অমনি দিয়ে দেওয়া হয়—সিকি পয়সা বা'র করবেন না! যে দিনকাল পড়্চে!"

সুহাসিনী দেখিল, তাহার সুখের উপর এ এক ...পত্তি জুটিল। ঠাকুরদাদা যদি একটি পয়সা বাহির করিতে চাহেন, ত, তাঁহার ঐ চেলাটি ছুটিয়া আসিয়া বলে—"হাঁ, হাঁ করেন কি! ও আধটা হ'লে বেশ চ'লে যাবে, বাজে খরচ করতে আছে—যে দিনকাল!"

এমনই করিয়া মাস দুই কাটিলে, হঠাৎ সে একদিন আসিয়া বলি... —"আজ বাড়ী যাচ্চি গো ঠাকুদ্দা!"—শুনিয়া সুহাসিনী মনে মনে হরিরলুট মানত করিল।

তারিণীদত্তর কিন্তু যাহা কোন দিন হয় নাই, আজ তাহাই হইল —বড় মন কেমন করিতে লাগিল। এই তরুণবয়স্ক ছেলেটি ভি... তাঁহাকে কেহ এমন করিয়া কোন দিন চিনিতে পারে নাই। দুঃখি... হইয়া বলিলেন—"কেন যাবিরে দেবু?"

দেবু নিতান্ত ঔদাস্যের সহিত ছাদের ভিতরদিক্ হইতে ... অন্ধকারমূর্ত্তি লম্বা ঝুলগুলা ঝাড়লণ্ঠনের মত ঝুলিয়া রহিয়াছি... তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে বলিল—"আর না গিয়ে কি কা...

ঠাকুদ্দা! ক'টা দিনই বা [illegible] আছি, এই ক'টাদিন ঘরের ছেলে ঘরেই থাকি গিয়ে, তা ছাড়া [illegible] হবে, উপায় যখন আর কিছুই নেই, তখন যাতে স্বর্গে টর্গে [illegible] পারি, তারও তো একটা পথ করতে হবে। তোমায় বলি, [illegible] বলো না; মিথ্যে মকদ্দমা ক'রে, একটা জমি কেড়ে নিয়েছিলাম, সেটা আর হাতে রাখ্‌বো না।—যাদের জিনিস, তাদেরি ফিরিয়ে দোব। আর দুটো দশটা টাকা কড়ি যা আছে সে-গুলোই বা কি হবে,—এইবেলা দান খয়রাত ক'রে পুণ্যি ক'রে নিই গে।"

তারিণী অবাক্ হইয়া গেল, "কি বল্‌ছিস্‌রে বাবা, তোর তো নেশাটেশা ত [illegible] ছিল না!"

দেবনাথ হাসিল—"আজও নেই গো ঠাকুদ্দা! তুমি কি কিছু শোননি?"

"কি শুন্‌বো?"

"কেন ঐ যে ধূমকেতুটা উঠ্‌চে দেখেছ তো? ও কি কর্‌বে তা বুঝি কিছুই জানোনা?—

"না, কি কর্‌বে?"

"১৮ই মে আমাদের পৃথিবীটা যে ধূমকেতুর ল্যাজের মধ্যে দিয়ে যাবে—জানোনা?"

তারিণীদত্ত উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন—"ভায়া ওসব কাগজ-ওয়ালাদের পাগলামি, অমন পুচ্ছমুচ্ছ ঢের ঢের পার হ'য়ে গেছে। পৃথিবীটে কি বেলেমাটির, যে আঙ্গুল লাগ্‌লেই ধ'সে যাবে?"

দেবনাথ অসহায় ভাবে বসিয়া পড়িল,—"হাস্‌চেন কি ঠাকুদ্দা! যখন হবে—তখন বল্‌বেন যে, হাঁ। সকল দেশেই এই নিয়ে মহা ধূম

লেগেচে,—রাজা থেকে ভিখারী পর্যন্ত [illegible] নিজের নিজের কাজ ক'রে নিচ্চে ; আমি তো এমন সুযোগ [illegible] পারিনে! দানটান করে এই বেলা একটা পথ ক'রে রাখি, [illegible] কখন ম'রে যাব, —কিছুই হবে না! আর এ কেমন [illegible] না,—ছেলেপিলে সপুরী একগাড়! কাঁদ্‌তে-ক'কাতে কেউ কোথা[illegible] থাক্‌বে না, যে কারু জন্য ভাব্‌তে হবে। দুহাতে ছড়িয়ে দাও, পুণি[illegible] ও পুণি[illegible]"

সেদিন প্রতিবেশী যাহারা বেড়াইতে অ[illegible]ল সকলকারই মুখে ঐ একই কথা! দেশটা একসঙ্গে যেন এক মহাশ[illegible] হইয়া বসিয়াছে। পরিণামও সবারই যে একই!

তারিণীদত্তর মনে এ চিন্তার ছায়াপাত হইল। [illegible] দেবুকে ডাকিয়া তিনি কহিলেন—"সত্যিরে দেবু! পৃথিবীটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে?"

মুখ চূণ করিয়া দেবনাথ দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল—"বিলাত থেকে—আমেরিকা থেকে এই কথাইতো সকলে বল্‌চে। কি রকমটা হবে, কে জানে! আমি ঠিক ক'রেচি, সেদিন একখানা গরদ পর্‌বো, কপালে চন্দনের ফোঁটা কেটে কোশাকুশি নিয়ে গঙ্গাতীরে—"

তারিণীদত্তর মনটা বড়ই কাতর হইয়া উঠিতেছিল ; ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিলেন—"আমার যে লাখটাকার ওপোর আছে,—সে সব কি হবে?"

"সব সিন্দুকে বন্ধ থাক্‌বে তাতে কি? চুরি কর্‌বার কেউতো বেঁচে থাক্‌বে না। তা, ও সিন্দুক-মিন্দুক সব একাকার লণ্ডভণ্ড! পৃথিবীটা যদি ঠোক্কর খেয়ে উল্টে যায়, তাহ'লে মানুষগুলো ওপোর

দিকে পা, নীচে [illegible]রে উল্‌টে পড়্‌বে, যদি বাঁয়ে হেলে তা'হলে—"

তারিণীদত্তর [illegible],—"[illegible]বে! হাঁরে দেবু, সত্যি কি সব যাবে রে?"

"কি জানি ঠাকুদ্দা! লোকে তো বল্‌চে ঐ রকমই। যদি বাঁয়ে হেলে আ[illegible] [illegible]রবাড়ী সিন্দুকপেটরা নিয়ে বাঁ কাতে গড়িয়ে পড়্‌বো, মাথা[illegible] হয়ত ঠোকাঠুকি হ'য়ে ছেঁচে যাবে, সিন্দুকটা [illegible] ক'রে এসে গা[illegible] উপর ছিট্‌কে পড়্‌বে, ডালা খুলে টাকার ছিনিমিনি খেলা—"

"[illegible]বি! সব ছড়িয়ে প'ড়ে কোথায় চ'লে যাবে! এক কাজ কর্‌লে হয় না দেবু?"

"কি?"

"দান কর্‌বো?"

"দান! দান মানেই নষ্ট, তাহ'লেই তো সব গেল!"

"পৃথিবী ধাক্কা খাবে একথা ঠিক তো?"

"জ্যোতিষ যদি সত্য হয়, তাহ'লে ঠিক।"

"ধাক্কা খেলে কেউ বাঁচ্‌বে না তো?"

"না, সেটা হলপ ক'রেই বল্‌তে পারি যে, ধাক্কা খেলে কেউ বাঁচ্‌বে না। পৃথিবীটাই খোলামকুচির মতন টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে গুঁড়িয়ে যাবে, তা মানুষের কি কথা।"

"যাবে তো?—তবে দানই করি?"

দেবনাথের এ প্রস্তাব তেমন মনঃপূত হইল না, সে খুঁৎখুঁৎ করিয়া বলিতে লাগিল—"দান, আহা সে যে সমস্তই খরচ হ'য়ে যাবে!